মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

ভূমিকা

লেখিকা এই পুস্তকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের নিকট গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় অনুসন্ধান করে যা পেয়েছেন, তাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। কথাগুলি সবই ঘরোয়া, সাধারণ কথা; কিন্তু এতেও গুরুদেবের একটি বিশেষ চিত্র পাওয়া যায়, তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের একটা দিক কিছু ফুটে ওঠে। গুরুদেবের সান্নিধ্য-প্রাপ্ত প্রাচীনাদের কথার সঙ্গে, তাঁদেরও অল্প কথায় সামান্য বর্ণনা দেবার প্রয়াস এতে আছে। লেখিকার ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাববিন্যাস সুনিপুণ শিল্পী-মনের পরিচায়ক। গ্রন্থখানি পড়ে পাঠকমাত্রেই যে তৃপ্তি পাবেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

শান্তিনিকেতন

১২ বৈশাখ ১৩৭১

নিবেদন

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের আশেপাশে মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের অন্বেষণ নিছক ভালো লাগার তাগিদে। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে অজানা কুসুম ফুটে অজ্ঞাতেই ঝরে পড়ে, তেমনি কয়েকটি কুসুম চয়ন করে অপটু হস্তে এ মালা গাঁথার প্রয়াস। ভুলত্রুটি হয়তো এতে আছে অনেক— তবু সুধীজন একে মেয়েলি স্মৃতিকথা বলেই ক্ষমা করবেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে অশেষ ধন্যবাদার্হ। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীরঞ্জন দাস এবং কবি-পুত্রবধূ শ্রদ্ধেয়া শ্রীপ্রতিমা দেবীর উৎসাহ-বাণীতে এ কাজে অধিকতর প্রেরণা জাগে— তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। যাঁদের সহৃদয় সহযোগিতায় এর রূপায়ণ, তাঁদেরও প্রত্যেককে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। সর্বোপরি, এতে গুরুদেবের ইচ্ছা সংযুক্ত আছে অনুভব করি— কারণ সকলের নিকটেই শুনি তিনি তুচ্ছকে কখনও তুচ্ছ মনে করেন নি, তার বদলে দিয়েছেন উদার মর্যাদা।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৭১

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতিকথা যাঁরা বলেছেন

আলাপিনী-মহিলা-সমিতি। বিবাহিতা মহিলা ও বয়স্কা গৃহিণীদের নিয়ে এই ক্ষুদ্র সম্মেলনীটি ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী মহাশয়ার অতি আদরের সামগ্রী রূপে শান্তিনিকেতনে তাঁরই গৃহ-অঙ্গনে আহূত হত। তাঁর মৃত্যুর পর এই সমিতি যেন মাতৃহারা শিশুর মতোই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় শুনতে পাওয়া গেল সগু-সংস্কৃত 'দেহলি' বাড়িটিতে তাকে স্থায়ী আসন দেওয়া হবে।

আনন্দিত মনে ওখানকার প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে যাই। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেহলির প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত আকাশ-তলে দুটি লণ্ঠনের আলোয় মুষ্টিমেয় মহিলার এই সম্মেলনী যেন স্বপ্নভারাতুর হয়ে উঠল।

কবিগুরু প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন; তাঁর ভগবৎ-প্রেম-ভাগীরথী কবিত্ব ও সুরের উচ্ছ্বসিত বন্যায় দুই কূল প্লাবিত করে গীতাঞ্জলিরূপে এখানেই প্রথম প্রবাহিত হয়েছে।

বাড়িটি ছোট্ট কিন্তু দোতলা; উপরে মাত্র একখানি ঘর, সেখানেই থাকতেন গুরুদেব একাকী, আর নীচের তলায় থাকতেন তাঁর সুরের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী।

এই সম্মেলনীতে স্থির হল প্রাচীনা—যাঁরা গুরুদেবের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্যে ধন্যা হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতি থেকে পুরনো দিনের অজানা ব্যক্তিগত কাহিনী তাঁরা ঘরোয়া ভাবে বলবেন। প্রথমেই অনুরুদ্ধ হলেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রদ্ধেয়া সুধীরা বসু।

সুধীরাদি বর্ষীয়সী হলেও জরা তাঁকে এখনও স্পর্শ করে নি। সুধীরাদি বললেন যে, তিনি বহুকাল শান্তিনিকেতনবাসিনী; ১৯১৯ সাল অর্থাৎ প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে এখানে আসেন। আজকের শান্তিনিকেতন ও সেদিনের শান্তিনিকেতনের ব্যবধান আকাশ পাতাল! বৃক্ষাদিবিহীন খোওয়াইয়ের দারুণ গ্রীষ্মের অনুপযুক্ত পাকা বাড়ির অস্তিত্ব তখন মোটেই ছিল না; দু-একটি পাকা বাড়ি ছাড়া তখন সবই মাটির কাঁচা বাড়ি। সে-সব বাড়িতে মনের আনন্দে বাস করতেন দেশের সেরা বিদ্বান, গুণী, শিক্ষকবৃন্দ। তাঁরা যেন ছিলেন, 'সাদা-মাটা থাকা ও অতি-উচ্চ-চিন্তার' প্রতীক। গুরুদেবের

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রভাব ও সাহচর্যে তাঁদের জীবনের পাত্র থাকত সদাই পরিপূর্ণ।

দেহলির বিপরীত দিকে দক্ষিণে কতকগুলি ভাঙা দেয়াল (যার অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত) দেখিয়ে সুধীরাদি বললেন, "এখানে ছিল একটি দোতলা পাকা বাড়ি। তারই উপর তলায় কলাভবন আরম্ভ হয় ; নীচে আরম্ভ হয় সংগীতভবন। বাড়িটির নাম দ্বারিক।"

গুরুদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে পাশ্চাত্য দেশ থেকে যাঁরা এসে তাঁর সান্নিধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মহামতি পিয়ার্সন তাঁদের অন্যতম। তিনিই দেহলির পাশে এই সুন্দর দোতলা বাড়িটি নিজ অর্থে প্রস্তুত করান— গুরুদেবের কাছটিতে থাকার জন্য। পরে তিনি এই বাড়ি আশ্রমকে দান করেন।

উপরতলায় কলাভবন ও নীচের তলায় সংগীতভবনের প্রথম পত্তন হয় এখানে। বহু দিনের সংস্কারাভাবে বাড়িটি ক্রমশ এত জীর্ণ হয়ে পড়ে যে ইদানিং তা ভেঙে দেওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় ছিল না : কাজেই এখন আর ঐ বাড়ির কোনো চিহ্ন নেই।

সকালে বিকালে ক্লাস, মধ্যাহ্নে কয়েক ঘণ্টার ছুটি। সকলে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন, গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষায়। এ সময় তিনি 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসখানি লিখছেন ; বিশ্রাম কাকে বলে জানতেন না, দুপুর বেলা ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে খাতাপত্র নিয়ে আসতেন দ্বারিকের দোতলায়, যতটুকু লিখেছেন পড়ে সকলকে শোনাবার জন্য।

সময়ের ব্যবধানে কলাভবন ও সংগীতভবন স্থানান্তরিত হয়ে গেল, দ্বারিক ছাত্রী-আবাসে পরিণত হল। অল্প কয়েকটি ছাত্রী নিয়ে ছাত্রী-বিভাগ কিছুকাল পূর্বে সবে শুরু হয়েছে ; মেয়েরা তখন হেমবালা সেনের অধীনে ছাত্রী-আবাসে থাকত। এমন দিনে প্রতিমাদি মীরাদি সুধীরাদি কমলাদি প্রভৃতি কয়েকজনের মাথায় জাগলো এক মজার খেয়াল। উদ্দেশ্য ছাত্রীদের সাহস পরীক্ষা ও তৎসঙ্গে অনাবিল কৌতুক উপভোগ।

গভীর রাত্রি, দারুণ গ্রীষ্মে মেয়েরা অধিনায়িকার সঙ্গে দ্বারিকের অঙ্গনে সুপ্তিমগ্ন— এমন সময়ে সেখানে ডাকাত পড়ল। কালীঝুলি-মাখা, পাগড়ি-পরা, লম্বা-লাঠি-হাতে ডাকাতের দল নিঃশব্দে মেয়েদের অলঙ্কার নিয়ে টানাটানি

শুরু করল। দু'চারটি মেয়ে ছিল অতি সাহসী। তেমনি একটি মেয়ের গলার হারে হাত দেওয়া মাত্র সে ডাকাতের হাতখানা এমন জোরে চেপে ধরল যে বেচারা ডাকাতের অবস্থা কাহিল। সে না পারে চেঁচাতে, না পারে হাত ছাড়াতে; অনেক ধস্তাধস্তির পর হাত ছাড়িয়ে তিনি ও তাঁর দলটি চক্ষের নিমেষে উধাও! এই ডাকাত-সর্দারটিই আমাদের কুসুম-কোমল-বৌঠান প্রতিমা দেবী।

এ দিকে মেয়েদের পরিত্রাহি চীৎকারে আশেপাশের অনেকেই বেরিয়ে এলেন। শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার মশাই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাড়াতাড়ি বন্দুক-হাতে এসে সকলকে 'কিছু না, কিছু না' বলে অভয় দিতে লাগলেন। সাহসী মেয়েরা ডাকাতের মুখোমুখী খুব সাহস দেখালেও, তারা চলে যাবার পর ভয়ে কম্পমান হয়ে মূর্ছা যাবার জোগাড়!

সন্তোষদা যত বলেন, "কিচ্ছু ভয় নেই, ও-সব নকল ডাকাত"— মেয়েরা ততই বলে, "তা বই কি! আমরা স্বচক্ষে স্পষ্ট দেখেছি, ইয়া লম্বা লাঠি হাতে কালো কালো যমের মতো সব ডাকাত! কাল ভোরেই আমরা যে যার বাড়ি চলে যাব— এ ডাকাতের দেশে আর নয়।"

ভালোমানুষ হেমবালাদি বলতে লাগলেন, "এতগুলি মেয়ে নিয়ে খোলা মাঠের মধ্যে এমন অরক্ষিতভাবে থাকতে আর আমার সাহস হয় না, যতশীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত রক্ষকের ব্যবস্থা চাই।"

ব্যাপারটা তাদের কিছুতেই বোঝাতে না পেরে নিরুপায় সন্তোষদা পার্শ্ববর্তী দেহলি থেকে কালী-মাখা কমলাদিকে এনে দেখিয়ে, অনেক করে বুঝিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করেন।

এর কয়েক দিন পরেই ভুবনডাঙ্গায় শিক্ষক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের বাড়ি পড়ল সত্যিকার ডাকাত! পরদিন ঘটনা শুনে, প্রতিমাদেবীকে ডেকে গুরুদেব হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৌমা, তোমাদের দল নয় তো?"

শুনে সেখানে হাসির হিল্লোল বয়ে গেল।

একবার সুধীরাদি কলকাতায় এসে দারুণ অসুস্থ হন। তৎক্ষণাৎ অপারেশন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ায় শান্তিনিকেতনে কর্মব্যস্ত স্বামীপুত্রকে উদ্বিগ্নতা থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ কোনো খবর না দিয়ে— মাত্র 'অপারেশন অনিবার্য' এইটুকু জানিয়ে— নিজেই দৃঢ় চিত্তে সব ব্যবস্থা করে ইডেন হাসপাতালের সাধারণ বিভাগে ভর্তি হয়ে অপারেশন করান।

জ্ঞান হওয়া মাত্র চোখ মেলে দেখেন, দরজার কাছে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন রথীবাবুর মামা নগেনবাবু। সুধীরাদির তখনও কথা বলার অবস্থা নয়, নগেনবাবু ওষ্ঠে তর্জনী রেখে এগিয়ে এসে বললেন, "কথা বলবেন না। গুরুদেব কাল বিকেলে আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার খোঁজ নিতে। কাল থেকে কত জায়গায়, কত হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি করছি, কিন্তু সন্ধান আর পাই না। এইমাত্র এখানে এসে শুনি, আপনার সদ্য অপারেশন হয়েছে। 'টেগোর' পাঠিয়েছেন শুনে, নিয়ম-বহির্ভূত হলেও আমাকে এই অসময়ে এখানে আসতে দেওয়া হয়েছে। কাল থেকে আপনার সঠিক খবর জানতে না পেরে গুরুদেবের মন অস্থির— আপনার অপারেশন ঠিকমত হয়েছে ও আপনি ভালো আছেন—আজই গিয়ে জানালে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন। আমি আর সময় নষ্ট না করে এখনি শান্তিনিকেতন রওনা হব।"

যাবার আগে নগেনবাবু নিঃশব্দে সুধীরাদির বালিশের নীচে গুঁজে দিলেন গুরুদেবের সই করা একখানা পাঁচশত টাকার চেক্!

ইডেন হাসপাতালের নির্বান্ধব রোগশয্যায় শুয়ে সুধীরাদি গুরুদেবের স্নেহের স্পর্শে অভিভূত! সেদিনই স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত হলেন, সাধারণ শয্যা থেকে 'কেবিনে'।

হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে ভাবেন—'শান্তিনিকেতনে বসে গুরুদেব এত ভাবছেন তুচ্ছ আমার জন্য! তিনি কী করে বুঝলেন আমার কষ্ট হচ্ছে এখানকার সাধারণ-শয্যায়? এত দরদ, এত উদারতা, এত ব্যাকুলতা পরের জন্য!'

সুধীরা বসুর মনের মণিকোঠায় এ স্মৃতি কোহিনূরের মতো দীপ্তিমান থাকবে চিরকাল।

সুধীরা বসু গুরুদেবের প্রথম দর্শন পান ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। নন্দলাল বসুর গুরুপত্নী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী সুহাসিনী দেবীর আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে সুধীরাদি জানতে পারেন, সেদিন 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে এক বিচিত্র অনুষ্ঠান হবে।

সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে যাবার সময় বিচিত্রার সিঁড়িতে তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটল। প্রণামাদির পর সুহাসিনী দেবী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এটি নন্দলালের বউ।"

সুধীরাদি গুরুদেবের মধ্যবয়সের অলৌকিক রূপ দেখে স্তব্ধ! তিনি বলেন যে, অমন আশ্চর্য রূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ এক-আধজন মহাপুরুষ ভিন্ন আর কারও দেখেন নি তাঁর সত্তর বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে।

প্রথম পরিচয়ের পর গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "নাম কী?"

'সুধীরা' নাম শুনে প্রীত হয়ে বললেন, "বাঃ এমন সুন্দর নামটি তোমার কে রেখেছিল? নন্দলালের বউ তুমি—শান্তিনিকেতনে তোমাকেও টানব।"

এর পর ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে সুধীরাদি প্রথম এলেন চারটি সন্তানের মা হবার পর। নন্দলালবাবু তখন গুরুদেবের আকর্ষণে এখানে এসেছেন কলাভবনের ভার প্রাপ্ত হয়ে। মুষ্টিমেয় ছাত্র নিয়ে দ্বারিকের দোতলায় তখন কলাভবনের প্রথম পত্তন; সুধীরাদি এখানে এসে প্রথম স্থান পেলেন দেহলি-সংলগ্ন 'নতুন বাড়ি'তে।

গুরুদেব তখন দেহলির উপরতলার বাসিন্দা, নীচে থাকেন তাঁর সুরের ভাণ্ডারী দিনুবাবু।

গুরুদেবের পাঠ আবৃত্তি গান আলাপ-আলোচনা সবই সুধীরাদিকে আকর্ষণ করত গভীর ভাবে। তখন প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আগমন হত বিদগ্ধ অতিথির। দিলীপকুমার রায়, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখরা এলে বসত গানের আসর ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গুরুদেব দিনুবাবু প্রভৃতি সকলে মিলে সে আসর এমন জমিয়ে তুলতেন যে, কারও সাধ্য হত না গৃহে ফিরে যান।

বর্ষার দিনে খোলা মাঠে বৃষ্টিতে ভিজে গুরুদেবের নূতন-লেখা বর্ষার গান গাওয়াও তখনকার দিনের আশ্রমবাসীদের ছিল এক মহা আনন্দ।

এক জ্যোৎস্না রাতে ছাত্রেরা গুরুদেবের নূতন লেখা 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' অথবা অনুরূপ একটি জ্যোৎস্নার গান গেয়ে চলেছে নেপাল রোড ধরে। হয়তো কোথাও সুরে একটু ভুল কানে বাজায় গুরুদেব দেহলির উপরের বারান্দা থেকে মুক্ত কণ্ঠে শুরু করেন ঐ গান। সমস্ত আশ্রমে সে সুর ছড়িয়ে পড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে গমগম ক'রে। শান্তিনিকেতনের সমস্ত আকাশবাতাস যেন গেয়ে উঠল সে সুরে সুর মিলিয়ে। যে যেখানে ছিল স্থাণুর মতো নিশ্চল হয়ে সেই অমৃতমাখা স্বরে মুগ্ধ হয়ে রইল। একটি মানুষের কণ্ঠস্বরে ভরে গেল সমস্ত আশ্রম। সুধীরাদি নতুন বাড়ি থেকে

শুনে ভাবেন, ভাগ্যে ছেলেরা একটু ভুল করে ফেলেছিল, তাইতো এ জ্যোৎস্না রাতে গুরুদেবের অপূর্ব কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য হল।

দোলপূর্ণিমায় আম্রকুঞ্জে বসন্তোৎসব শান্তিনিকেতনের চিরাচরিত প্রথা। সব উৎসবই গুরুদেবের উপস্থিতিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়; কিন্তু সেবার গুরুদেব অসুস্থ থাকায়, ডাক্তারের নিষেধে তাঁর বাইরে যাওয়া বা উৎসবে যোগদান বন্ধ।

সেদিন অতি প্রত্যূষে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা সুধীরাদি ও তৎকালীন আশ্রম-বাসিনী পার্শী মহিলা মিসেস্ ভকিলকে পুরোভাগে নিয়ে ছাতিমতলা থেকে 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গানটি গাইতে গাইতে গুরুদেবের তৎকালীন আবাস উত্তরায়ণে এলেন। ইচ্ছা গুরুদেবের শয্যা-ত্যাগের অনেক আগে তাঁর দরজায় এসে প্রণাম ও ফাগ নিবেদন।

প্রায় নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গুরুদেবের শয়নকক্ষের দ্বারে এসে সব চিত্রার্পিত! দেখা গেল, সেই দিন-রাত্রির মোহানার আলো-আঁধারীতে উন্মুক্ত দ্বারে গুরুদেবের শ্বেত জোব্বা পরিহিত শুভ্র দেবমূর্তি!

সকলে একে একে বসন্তোৎসবের কুসুম-কুঙ্কুমে তাঁর পাদবন্দনা করে ধন্য হল। তিনিও সকলকে নীরব আশীর্বাদ দিলেন।

একটু বাদেই শোনা যায় দিনুবাবুর ডাক পড়েছে উত্তরায়ণে নূতন গান তুলে নেবার তাগাদায়। সেই দিনই বিকালে দিনুবাবু শিক্ষার্থীদের শেখালেন— 'ঐ শুনি যেন চরণ ধ্বনি রে।'

সুধীরাদির তৈরি নানারকম খাবার, ভাপা দই, তাঁর গাঁথা সুন্দর ফুলের মালা ছিল গুরুদেবের অতি প্রিয়। সুধীরাদি নানা ছাঁদে ফুলের মালা ও ফুলের গহনা তৈরিতে ছিলেন সুনিপুণা। গুরুদেবের অসুস্থ অবস্থায় তিনি প্রায়ই নূতন নূতন ঢং এ গাঁথা মালা দিতেন। যতদিন না আর-একটি মালা দেওয়া হত ততদিন গুরুদেব আগের শুকনো মালাটি ফেলতে দিতেন না, টেবিলেই রাখা থাকত।

গুরুদেবের অসুখের শেষের দিকে ভীষণ অক্ষুধা—মুখে অসম্ভব অরুচি, কিছুই খেতে চান না। সুধীরাদির তৈরি ভাপা দই এনে দিলে একটু খেয়ে বলতেন, "বরফ-কলে তুলে রাখো, পরে আবার খাব।"

তার পর আর কদিন? অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে শেষ অপারেশনের জন্য চিরদিনের মতো আশ্রমের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়।

হেমবালাদি শান্তিনিকেতনের প্রাচীনাদের একজন। একদিন ঘটনাক্রমে আসি তাঁর কাছে। সময়টা মেয়েদের বেড়াবার পক্ষে অসময়। বেলা দশটা— গ্রীষ্মের সূর্যদেব মাথার ওপরে আগুন ঢালছেন; এহেন সময়ে স্বল্প-পরিচিতার তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে কি না বুঝতে না পেরে অনেক ইতস্তত করে অবশেষে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করি।

আশাতিরিক্ত আদর-সম্ভাষণে মন ভরে গেল। পূর্বপল্লীর প্রান্তে নিরিবিলি বাড়িখানা। বাসিন্দা দুটি সমবয়সী বর্ষীয়সী মহিলা। হেমবালাদির পূর্ণনাম শ্রীযুক্তা হেমবালা সেন। বয়স প্রায় পঁচাত্তর। তিনি তাঁর দীর্ঘ কুমারীজীবন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী-আবাসের তত্ত্বাবধায়িকার কাজে নিয়োগ ক'রে এখন শান্তিতে বার্ধক্যের অবসর-জীবন যাপন করছেন। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বিনী। সাথি— তাঁরই বয়সী তাঁর বিধবা ভ্রাতৃজায়া। মাতৃসমা দুই প্রবীণার সহৃদয় ব্যবহার সত্যই মনোমুগ্ধকর।

গুরুদেব সম্বন্ধে পুরনো দিনের কথা তাঁর নিকট কিছু শুনতে চাওয়ায় তিনি বললেন যে, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদেবের আহ্বানে তিনি কলকাতা ব্রাহ্ম-গার্লস-স্কুলের কাজ ছেড়ে এখানে আসেন। তার মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রীবিভাগ প্রথম আরম্ভ হয়। হেমবালাদি যখন ছাত্রী-আবাসের তত্ত্বাবধায়িকার কর্ম গ্রহণ করলেন, তখন সেখানে ছাত্রীসংখ্যা ছিল মোট তেরোটি। দ্বারিকের নীচের তলা ও দেহলির পিছনে কয়েকটি খড়ের ঘরে বিচ্ছিন্ন ভাবে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন, "মেয়েদের সব ভার তোমার; কি করলে তাদের উপকার হয়— কিসে তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া যায়, তাদের মানসিক বিকাশের সাহায্য হয় তুমি নিজেই তা ঠিক করবে। এখানে যাঁরা যে দিকের ভার নিয়ে আছেন, তাঁরা নিজেরাই তাঁদের কর্মপন্থা স্থির করেন, তুমিও তাই কোরো। তবে অসুবিধা কিছু হলে আমাকে জানিও।"

প্রতি বৎসর শীতকালে ছাত্রাবাসের ছেলেরা এখনকার মতোই বিভিন্ন শিক্ষকের অধীনে দলে দলে বাইরে যায় প্রমোদ-ভ্রমণে। এখনকার মতো

গাড়ি-ঘোড়ায় কিংবা রেল-স্টিমারে নয়, একেবারে ভারতীয় প্রাচীন পদ্ধতিতে পদব্রজে। তবে সঙ্গে জিনিসপত্র, রসদ, তাঁবু প্রভৃতি নিয়ে যাবার জন্য দু'চারখানা গোরুর গাড়িও সঙ্গে থাকত। গুরুদেবের নির্দেশ ছিল, বীরভূম জেলার মধ্যেই ভ্রমণ সীমাবদ্ধ রেখে দর্শনীয় সব দেখার।

বীরভূম জেলাটি সত্যই সুন্দর, এর দিগন্তবিস্তৃত খোলা মাঠ, স্থানে স্থানে অনুর্বর শুষ্ক মাটি, চন্দ্র সূর্য তারকার অপূর্ব দীপ্তি মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দ জাগায়। এখানে সাধু সন্ত কবি লেখকের প্রচুর সমাবেশ সেই প্রাচীন কাল থেকেই। আবার সতীদেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ভারতের ৫১ পীঠের কয়েকটি পীঠস্থান এই জেলায়। কাছেই জয়দেবের কেঁদুলী গ্রাম অজয় নদীর ধারে। যেখান থেকে একদিন গীতগোবিন্দের মতো ভাবসমৃদ্ধ ভক্তিগীতি মহাপুরুষ জয়দেবের লেখনী-নিঃসৃত হয়ে শত-সহস্র জনের প্রাণে মহানন্দের উদ্রেক করেছে।

আর একদিকে চণ্ডীদাসের লীলাভূমি নান্নুর। আজও সেখানে সেই দিঘি, রামী-ধোপানীর ঘাট, চণ্ডীদাস-পূজিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রভৃতি প্রচুর স্মৃতিচিহ্ন বিরাজমান।

অন্যদিকে মহাশ্মশান তারাপীঠ। কত কাপালিক, সাধু, মাতৃ-সাধক, আউল-বাউল এর পথে-প্রান্তরে নির্জনতার কোলে ছড়িয়ে আছে তা কে জানে?

মেয়েরা ধরে বসল, "ছেলেরা বাইরে বেড়াতে যায় তো আমরাই বা যাব না কেন? এবারের প্রমোদ-ভ্রমণে আমরাও যেতে চাই।"

সেকালের শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার মহাশয় একদল ছাত্র নিয়ে সেবার যাবেন শান্তিনিকেতন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে উষ্ণ-প্রস্রবণ দেখতে বক্রেশ্বরে; হেমবালাদি গুরুদেবের সম্মতিক্রমে মেয়েদের নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যাওয়া স্থির করলেন। এই এখানকার ছাত্রী-আবাসের মেয়েদের প্রথম প্রমোদ-ভ্রমণ। পদব্রজে বক্রেশ্বরে পৌঁছাতে তাঁদের তিনদিন সময় লেগেছিল।

নির্দিষ্ট দিনে আহারাদি সম্পন্ন করে বক্রেশ্বরে যাত্রার পূর্বে গুরুদেবকে প্রণাম করতে সকলে গেলেন উত্তরায়ণে। প্রণাম-পর্ব চুকে যাওয়ার পর একবার সকলের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করেই গুরুদেব বলে উঠলেন, "এ কী! তোমরা পায়ে হেঁটে কত দূরের রাস্তায় যাচ্ছ, যেখানে-সেখানে

তাঁবুতে রাত্রিবাস করতে হবে, গায়ে সোনার অলঙ্কার কেন? শিগগির সব খোলো। সকলের চুড়ি, বালা, হার, বৌমার কাছে জমা রেখে তবে যাও।"

হেমবালাদির নারীচক্ষে যা ধরা পড়ে নি, তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নিমেষে তা ধরা পড়ে গেল।

আর একবার মেয়েরা ধরলো—কঙ্কালীতলার মেলা দেখতে যাবে। চৈত্রসংক্রান্তিতে শান্তিনিকেতনের মাইল চারেক দূরে কঙ্কালীতলায় মস্ত মেলা বসে: আশে-পাশের বহু গ্রামবাসী সেদিন সেখানে যায় পুজো দিতে।

কঙ্কালীতলা পুণ্য পীঠস্থান। কিংবদন্তী এবং এদিককার লোকের অখণ্ড বিশ্বাস, নারায়ণের চক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে সতীর কাঁকালের একখানা হাড় পতিত হয়েছিল। মন্দির নেই, মূর্তি নেই, আছে শুধু একটি গাছপালায় ঢাকা নির্জন শান্তিপূর্ণ স্থানে ছোট্ট একটি জলাশয়—চলতি ভাষায় ডোবা। এই ডোবাতেই লোক ফুল-বেলপাতা দিয়ে ৺মায়ের উদ্দেশে পূজা দেয়। এই ছোট্ট ডোবাটির জল নাকি বীরভূমের দারুণ গ্রীষ্মেও কখনো শুকায় না।

হেমবালাদি মেয়েদের এ আব্দারও পূর্ণ করলেন। গন্তব্যস্থান অতি নিকট, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লে বেলা বারোটার মধ্যে ফিরে এসে অক্লেশে স্নানাহার সমাধা করা যায়। গুরুদেব সেদিন কি এক দরকারি কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তাঁকে জানাবার সুবিধা হল না। সংক্ষিপ্ত পথ, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন মনে করে হেমবালাদি মেয়েদের নিয়ে প্রত্যূষে বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই গুরুদেবের কর্ণগোচর হল এ সংবাদ। চৈত্র মাসের দারুণ গ্রীষ্ম—তদুপরি বীরভূমের অত্যন্ত চড়া রোদ। মেয়েদের জন্য তিনি বিষম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোক পাঠাতে লাগলেন, ওরা ফিরে এসেছে কি না জানবার জন্য।

এ দিকে হেমবালাদির সঙ্গে মেয়েরা খুব আনন্দ করে দেখে শুনে বেলা বারোটার মধ্যেই ফিরে এলো নিজেদের আস্তানায়। স্নানাহার সমাধা করে যে যার শয্যায় এলিয়ে পড়ল। গুরুদেবের লোক-পাঠানোর খবর জানতে না পারায় হেমবালাদিও নিজের কামরায় বিশ্রাম নিলেন।

বেলা ছুটো। রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়ে যাচ্ছে, কোনো দিকে যেন চোখ মেলে তাকানো যায় না, এমন সময় হেমবালাদির বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত!

তিনি উঠে দরজা খুলে সামনেই গুরুদেবকে দেখে অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সময়ে, এত রোদ্দুরে আপনি এত কষ্ট করে কেন এলেন? আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন?" স্নিগ্ধ হেসে তিনি বললেন, "আমি শুধু খবর নিতে এলাম, সবাই সুস্থশরীরে ফিরে এসেছ তো? যাতায়াতে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় নি তো?"

মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখে হেমবালাদি বিস্ময়ে হতবাক্!

গুরুদেবের গানের বিষয়ে একটু জানতে চাওয়ায় হেমবালাদি বললেন যে, দেহলির নীচের তলায় থাকতেন দিনেন্দ্রনাথ, আর গুরুদেব তখন ছিলেন নির্মীয়মাণ উত্তরায়ণের এক অংশে। উত্তরায়ণের অতি সামান্য অংশই তখন তৈরি হয়েছে। দেহলি থেকে উত্তরায়ণের দূরত্ব বেশ খানিকটা, যখনই গুরুদেব নূতন একটি গানের কথা ও সুর সৃষ্টি করতেন তৎক্ষণাৎ দেহলিতে এসে দিনেন্দ্রনাথকে তা শুনিয়ে ও শিখিয়ে দিয়ে দিনুবাবুর ভাণ্ডারে তাকে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হতেন। না হলে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তা তাঁর মন থেকে মুছে যেত ও নূতন সুরের গুঞ্জন উঠত। পরে শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর নিকট শুনি এ বিস্মৃতি ছিল তাঁর স্বেচ্ছাকৃত। কারণ, পুরাতন সুর মন থেকে একেবারে নির্বাসিত ক'রে তবে আবার সেখানে তিনি নূতন সুরের আমদানী করতেন।

উত্তরায়ণ ও দেহলিতে এই যাওয়া-আসার কোনো সময়-অসময় ছিল না, দিনরাত্রির যে কোনো সময়ে তিনি এতটা পথ আসা-যাওয়া করতেন।

তিনি কি প্রথমে কবিতা রচনা করে পরে তাতে সুর-সংযোগ করতেন? যা সাধারণ বুদ্ধিতে হওয়া উচিত মনে হয়— এ প্রশ্নের জবাবে তা শুনি না, শুনি ঠিক এর বিপরীত। তাঁর অনেক সময়েই সুর আগে মনে হত, মনের মধ্যে সুরের গুঞ্জন উঠলে, উপযুক্ত কথা তাতে আপনিই এসে পড়ত, অন্ততঃ হেমবালাদির অভিজ্ঞতায় তাই মনে হয়।

ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিনের মতো তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আজীবন শিক্ষাব্রতী, হেমবালা সেন বহুদিন শান্তিনিকেতন ও গুরুদেবের সঙ্গে নানা বন্ধনে জড়িত। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় চল্লিশ বৎসর আশ্রমের সেবা করার পর যখন কর্মত্যাগ করে কলকাতায় যান তখন

গুরুদেবের লেখা একখানি চিঠিতে তাঁর দরদী মনের যে স্পর্শ পাওয়া যায় তা অনবদ্য। চিঠিখানার ফোটোস্ট্যাট অন্যত্র প্রকাশিত হলেও, খানিকটা তুলে ধরি।

কল্যাণীয়াসু,

উৎসবে তুমি আমাদের কাছে আসবে শুনে মনে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলুম। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে গভীর একটা বেদনা আছে, তুমি যদি আসতে পারতে তা হলে অনেকটা উপশম হত। তোমাকে আমি যথার্থই স্নেহ করি, তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন এ কথা নিঃসংশয়ে জেনো। আমাদের আশ্রমিকজীবনে বহু দিনের সুখদুঃখের সঙ্গে তুমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সে কথা কখনোই ভোলবার নয়।

তুমি আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো···। ইতি

৮ই পৌষ ১৩৩৪ স্নেহরত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন ছেড়ে এলেও হেমবালাদির মন থাকত এখানকার স্মৃতিতে ভরপুর। তিনি বলেন যে, বসন্তোৎসবে শালবীথিতে গুরুদেব তাঁর নূতন লেখা বসন্তের কবিতাগুলি যখন একের পর এক আবৃত্তি করে শোনাতেন তখন তাঁর রূপ স্বর আবেগ কাব্যরস সব মিলে সে স্থানটিতে যে অপূর্ব রস সৃষ্টি হত তা যে প্রত্যক্ষ না করেছে তাকে বোঝানো যায় না।

হেমবালাদি ভাবতেন, 'গুরুদেবের বয়স হয়েছে, তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। তাঁর অবর্তমানে মানুষ তাঁর অপরিমেয় লেখা পড়বে, তাঁর দেওয়া সুরে তাঁর অসংখ্য গান গাইবে কিন্তু আমরা যা পেলাম তাঁর সুকণ্ঠে, সেটুকু তো শত চেষ্টাতেও কেউ পাবে না। তাঁর আশেপাশের মানুষ আমরা, আমাদের কি সৌভাগ্য।'

একবার আম্রকুঞ্জে ফাল্গুনী অভিনয়ে অন্ধ বাউল সেজে গুরুদেব এমন গান গাইলেন যে তেমন গান, তেমন অভিনয় নাকি এখানে আর কেউ কোনো দিন শোনে নি দেখে নি।

হেমবালা সেনের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী কিশোরী অমিতা সেন ছিলেন সংগীত-প্রিয়। পাটনাবাসিনী এই ভাইঝিটিকে নিজের কাছে আনিয়ে এখানে স্কুলে ভর্তি করেন, ও গুরুদেবকে তার সংগীতে রুচির কথা জানান। গুরুদেব পরম

আগ্রহে ছোটো মেয়েটিকে গ্রহণ করে শেখাতে থাকেন বহু গান। দিনুবাবুও তাকে সযত্নে সংগীত শিক্ষা দিতেন। মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেমন মধুর, শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতাও সেই রকম অসাধারণ। ক্রমশ সে রবীন্দ্রসংগীতে পারদর্শিনী হয়ে ওঠে।

অমিতা এম. এ. পাস এবং ছখানা রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড করার পর মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করে।

গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল তাঁর অনেক গান অমিতার কণ্ঠস্বরে রেকর্ড করিয়ে দেশবাসীকে দিয়ে যান, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না।

আরও একটি অদ্ভুত গুণী মহিলার কথা হেমবালাদির নিকট শুনি—তিনি কলাভবনের গোড়ার দিকের সুকুমারীদেবী।

পূর্ব-বাংলার এক কোণে বারো বৎসরের বিধবা সুকুমারীদেবী পড়ে ছিলেন অনাদৃত ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। গুণগ্রাহী গুরুদেব তাঁর কথা শোনেন তদানীন্তন শিক্ষক কালীমোহন ঘোষের নিকট। কালীমোহন বাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা মনোরমা ঘোষের আপন মাসি তিনি। পল্লীগ্রামবাসিনী মহিলাটি আলপনা দেওয়ায় সিদ্ধহস্তা। তাঁর কথা শুনেই গুরুদেব আগ্রহভরে তাঁকে এনে স্থান দেন কলাভবনের মধ্যে। এখানে নন্দলালবাবুর পরামর্শে এবং নির্দেশে তাঁর সহজাত আলিম্পন-শক্তি আরও বিকশিত হয়ে ওঠে।

আজ শান্তিনিকেতন যে আলপনার জন্য দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে, তার মূলে রয়েছেন ঐ অনাদৃতা অপরিচিতা পল্লীবালা।

যে আলপনা চিরকাল পাড়াগাঁয়ের মাটির উঠানে লক্ষ্মীপূজায়, মাঘমণ্ডল, পুণ্যিপুকুর ব্রতে আবদ্ধ হয়ে ছিল, গুণগ্রাহী গুরুদেব তাকে সেখান থেকে সাদরে আহরণ করে এনে দিলেন সুধীজনের দরবারে।

গুরুদেবের সুন্দর হস্তাক্ষরে ছোটো একটি কবিতা লেখা অতি পুরাতন জীর্ণ একখানি খাতা হেমবালাদির পুরানো চিঠিপত্রের ঝাঁপিতে রয়েছে। এই খাতাখানা হেমবালাদিকে গুরুদেবের সস্নেহ উপহার। প্রথম পাতার কবিতাটি—

আপনারে তুমি লুকাবে কেমন করে,
হে তাপসী বিভাবরী,
হের তারাগুলি তব নীরবতা ভরে,
দিতেছে প্রকাশ করি।

৩

ঘুরে ঘুরে একদিন যাই টুলুদির কাছে। তিনি পূর্বপল্লীবাসিনী, শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রী-বিভাগের প্রাচীনতমা, আদি ছাত্রীদের অন্যতমা। এখানকার প্রাচীন শিক্ষক স্বনামধন্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় তাঁর ভগ্নীপতি। স্বামী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গুপ্ত মহাশয় সরকারী কর্মে অবসর-প্রাপ্ত। এখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে টুলুদি নামে পরিচিতা হলেও, নাম তাঁর হেমলতা গুপ্ত।

সদালাপী হাস্যমুখী টুলুদির নিকট পুরাতন কথা কিছু শুনতে চাওয়ায় বলেন যে, তিনি তাঁর শৈশবে, অর্থাৎ ১২।১৩ বৎসর বয়সেই শান্তিনিকেতনে আসেন, এবং এখানেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। অত অল্প বয়সে আসার যে কারণটি তিনি বলেন, তা খুবই হৃদয়স্পর্শী।

গুরুদেব শিলাইদহে বাসকালে বোধ হয় গ্রাম-গ্রামান্তরে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে বাঙালি মেয়েদের দুর্দশা দেখে বড়োই ব্যথিত হন। তিনি দেখেন, মেয়েরা শুধুই খাঁচার পাখির মতো গৃহ-কোণে আবদ্ধ থাকে— খাওয়ার পরে রাঁধে, আর রাঁধার পরে খায়— বহুবিধ কুসংস্কারে জর্জরিত। মেয়েদেরও যে প্রাণ আছে, পুরুষের মতোই সর্বপ্রকার কর্মক্ষমতা আছে— তা তারা নিজেরাই সম্পূর্ণ বিস্মৃত! এই আত্মবিস্মৃত নারীজাতির কল্যাণে কিছু করার জন্য, তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের অভিলাষে, অন্তরঙ্গ ক্ষিতিমোহনবাবুকে বলেন, "যদিও শুধু ছেলেদের জন্যই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে এ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে; ছেলে মেয়ে দুই নিয়ে সমাজদেহ, তার এক অঙ্গের পুষ্টি ও অন্য অঙ্গের জীর্ণতায় কখনোই দেহটি সম্যক বিকশিত হতে পারে না, এইজন্য আমার আজকাল খুবই মনে হচ্ছে গুটিকতক মেয়ে পেলে একটি মেয়েবিভাগও আরম্ভ করি।"

তখনকার দিনে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মপরিবার ভিন্ন হিন্দুদের ভিতরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার খুবই সামান্য ছিল। বাল্যবিবাহ পর্দাপ্রথা প্রভৃতির লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ মেয়েরা কেবল নিজের সংসারেই ঘুরপাক খেয়ে মরত, নিজের আত্মীয়-

স্বজনের বাহিরেও যে একটি বিরাট পৃথিবী আছে, মেয়েরাও যে লেখাপড়া শিখে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, পুরুষের মতোই পরীক্ষায় পাস করে অর্থ উপার্জন করতে পারে— সর্বোপরি অব্যাহত মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারে— গার্গী-মৈত্রেয়ীর দেশের মেয়েরা তা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। গুরুদেবের করুণ উদার মন এর প্রতিকারের জন্য এত ব্যগ্র হয়েছিল যে, তাঁর আবেগ-কম্পিত আলোচনা ক্ষিতিবাবুর মনেও বোধ হয় তীব্র রেখাপাত করেছিল।

পরের ছুটিতে তিনি যখন তাঁর দেশ ঢাকায় যান তখন বারো-তেরো বৎসর বয়স্কা কিশোরী শ্যালিকা টুলুদি ও তাঁর বন্ধুবর ডাক্তার প্রসন্ন সেন মহাশয়ের দুই কন্যা হিরণ এবং ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে যুক্ত হল লাবণ্যদি ও আরও দু'তিনটি মেয়ে। অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে পরে লাবণ্যদির বিবাহ হয়।

এই ৫।৭টি মেয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্রীবিভাগ খোলা হল। বালিকাদের দেখাশোনার ভার নিলেন অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের মা— এখানকার সর্বজনীন মাসিমা।

টুলুদি বাল্যস্মৃতি থেকে দু'চারটি ঘটনা বলেন। তিনি বললেন, "গুরুদেবকে শিশুকাল থেকেই নিজের পিতার মতো করে দেখেছি ও পেয়েছি। তিনি যে কত বড়ো ছিলেন— জগৎ-জোড়া তাঁর কত খ্যাতি—এ-সব কথা একবারও মনে হত না। অতি সহজেই তাঁর কাছটিতে যেতে পারতাম, তিনিও সেভাবেই আমাদের গ্রহণ করতেন। প্রত্যেকেই মনে করতাম, আমাকেই বুঝি তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন; অবশ্য পরের জীবনে বুঝেছিলাম, এটি মহামানবের লক্ষণ। আশ্রমের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা গাছের পাতা ছিঁড়লে, কি কোনো প্রকারে তাদের কোনো অনিষ্ট করলে গুরুদেব অত্যন্ত দুঃখিত হতেন; তখন সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন যে, গাছগুলোও আমাদেরই একজন, আমরা যেমন এখানকার আলো, হাওয়া, খাদ্যে পুষ্ট হচ্ছি, বড়ো হচ্ছি, ওরাও তাই। ওদেরও প্রাণ আছে, ওদের পাতা ছিঁড়ে কষ্ট দেওয়ার মানে, নিজের ভাইকে কষ্ট দেওয়া। শিশুমনে কথাগুলো এত গভীর দাগ কেটে বসেছিল যে, আজও পরিষ্কার মনে আছে।

কিছুকাল বাদে রথীদার খুব ধুমধাম করে বিয়ে হল; প্রতিমা-বোঠান

নববধূ বেশে চতুর্দিক উজ্জ্বল করে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। আমরা ছাত্রছাত্রীর দল ভিড় করে কনে-বৌ দেখতে গেলাম। লক্ষ্মী-প্রতিমা বোঠান সকলকে একটি করে উপহার দিয়ে আশ্রম-শিশুদের সঙ্গে ভাব করলেন। আমার ভাগ্যে উঠেছিল একটি 'লিপি-স্থালী' (রাইটিং-প্যাড)। কিশোরমনের সে আনন্দের দিনগুলি স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল।

প্রতিমা-বোঠান আসার পর গুরুদেব মন্দির-সংলগ্ন শান্তিনিকেতন-ভবনে দোতলায় বাস করতেন। বুধবার ছুটি— সেদিন সেই বাড়িটিতে আশ্রম-ছাত্রীদের আনন্দের মেলা বসত। সারাদিন বোঠানের সঙ্গ, চড়ুইভাতি, আনন্দ করে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, বিকেলে গান,আবৃত্তি প্রভৃতিতে দিনটি যে কোথা দিয়ে কেটে যেত কেউ বুঝতেও পারত না।

গুরুদেব তখন এই মেয়ে-কটিকে নিয়ে আরম্ভ করলেন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটকটির মহড়া। তাঁর শিক্ষায় অল্প দিনের মধ্যেই মেয়েরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' মঞ্চস্থ করতে পেরেছিল— অবশ্য সম্পূর্ণ ঘরোয়া ভাবে। তখনও মেয়েদের নৃত্যগীত, নটকুশলতা, আজকের মতো প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন করার রীতি মোটেই প্রচলিত হয় নি। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের অভিনীত এই প্রথম নাটক। এতে বোধ হয় শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা-বোঠান, মীরাদি ও তাঁদের দু একজন আত্মীয়াও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।"

এখানে শুনি একটি অভিনব কাহিনী। তখনকার দিনের প্রচলিত রীতিতে মেয়েরা চিকের আড়ালে বসেই নাটক, গান প্রভৃতির রসাস্বাদন করত, কিন্তু শান্তিনিকেতনে অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকায় এখানে এ ব্যবস্থা ছিল না; সকলে প্রকাশ্যে বসেই উৎসবে যোগ দিতেন।

সেবার ঘটল বিপরীত কাণ্ড। নাটকের অংশ গ্রহণকারিণী মেয়েরা লজ্জাশীলা; তারা কিছুতেই পুরুষের সামনে অভিনয় করতে পারবে না। কাজেই স্থির হয় শান্তিনিকেতনের মেয়েদের প্রথম নাটকে পুরুষ দর্শকের স্থান থাকবে না।

গুরুদেব শুনে বলেন, "তাই তো! এত করে মেয়েদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' শেখানো হল, আর আসল দিনটিতে আমরাই বাদ পড়ব! তা, আমি আর ক্ষিতিমোহন প্রভৃতি দু চারজন প্রবীণ শিক্ষক যদি দূরে বসে দেখি?"

না,— মেয়েরা তাতেও নারাজ! তারা বলে, "সামনে পুরুষমানুষ বসে

আছে দেখলে, আমাদের সব গুলিয়ে যাবে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে না। এ হতেই পারে না।"

গুরুদেব শুনে, ভেবেচিন্তে বলেন, "তা হলে এক কাজ করা হোক। দর্শিকাদের একপ্রান্তে একটু স্থান চিক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক, আমরা অল্প কয়েকজন সেখানে বসেই মেয়েদের অভিনয় দেখব। তা হলে তো আর অভিনেত্রীরা আমাদের দেখতে পাবে না। তাদের সরম-কুণ্ঠার কোনো বাধাও থাকবে না।"

হাস্য-পরিহাসের মধ্যে ঐ প্রস্তাবই গৃহীত হল, এবং গুরুদেব প্রমুখ কয়েকজন চিকের আড়ালে বসে, মেয়েদের অভিনীত প্রথম নাটক দেখে খুশি হলেন।

গান আবৃত্তি ও অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা দেবার ফাঁকে ফাঁকে গুরুদেব নাকি প্রায়ই মেয়েদের বলতেন, "তোমরা সর্ব প্রকারে শিক্ষিতা হও, কল্যাণী হও, কিন্তু কখনো কোনো প্রকারেই উচ্ছৃঙ্খল হোয়ো না।"

গুরুদেবের মুখের আরও একটি বাণী—'নারীজাতি— মায়ের জাতির মলিন মুখ আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে।' টুলুদির নিকট শুনে নিজেকে ধন্য মনে করে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিলাম।

শান্তিনিকেতনের এক বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট শুনি এক বিচিত্র কাহিনী। কোনো উপলক্ষে গুরুদেব এসেছেন কাশীতে। দিনগুলো কর্ম-ব্যস্ততায় মুখর, এমন সময় এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক এলেন একটি আবেদন নিয়ে। অশীতিপরা বৃদ্ধা কাশীর এক বিখ্যাত বাইজী অল্প একটু সময়ের জন্য গুরুদেবের দর্শন চান। তিনি অনেক আশা করে আছেন, বাসনা পূর্ণ করতেই হবে।

গুরুদেব চিন্তান্বিত হলেন। সকাল বিকাল সভা-সমিতির কাজে পূর্ণ, একটুখানি শুধু সময় পাওয়া গেল মধ্যাহ্ন-আহারাদির পর বেলা একটায়। তিনি সেদিনের মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের সময়টুকু বাইজীকে দিলেন।

এলেন বাইজী। লোলচর্মা, গৌরবর্ণা বাইজীর চেহারা একটু নেপালী ধাঁচের; পোষাক শুচিশুভ্র বেনারসী রেশমে তৈরি, নাকে নাকছাবি, কথা বলেন হিন্দীতে। তিনি এসেই গভীর শ্রদ্ধায় গুরুদেবের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিলেন। বললেন, "সমস্ত জীবন কিছুই করি নি শুধু গান ছাড়া; কণ্ঠস্বরই আমার জীবন-মরণের পাথেয়। ভুল-চুক তো যথেষ্ট হয়েছে এ জীবনে, তবুও মনে হয়, বিধাতা হয়তো আমার পূজা গ্রহণ করেছেন। আমার মন্ত্রদাতা গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বে, আমার গানের ডালা উজাড় করে কারো পায়ে দিয়ে যেতে; আপনিই তার উপযুক্ত আধার— আজ আপনার পায়েই আমার সমস্ত গানের শেষ নিবেদন। দয়া করে গ্রহণ করুন।"

গুরুদেবের নিকট অনেকে অনেক আবেদন নিয়ে আসেন, কিন্তু এ একেবারে অনবদ্য। কবিসম্রাট, সুরস্রষ্টা, পৃথিবীর বিস্ময়, নিজেই বিস্মিত হলেন; চেয়ারে বসে একটু একটু পা দোলাচ্ছিলেন, তা বন্ধ হয়ে গেল, নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।

আরম্ভ হল গান। একটির পর একটি গান বাইজী গেয়ে চললেন। সে বয়সেও গলার কি জোর, সুরের কত কারিকুরি! কণ্ঠস্বর উঠে যায় কত উচ্চে, যেন অসীমে মিশে এক হয়ে যেতে চায়, পরমুহূর্তে নেমে এসে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে। সে এক অপূর্ব সুরের নিবেদন! চক্ষে দর-বিগলিত ধারা,

গুরুদেবের চোখ-দুটিও ছলোছলো। আশে-পাশে দু-একজন যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও তাই। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই সংগীত-সুধা প্রাণ ভরে পান করতে লাগলেন। ঘণ্টা দুই এ ভাবে কাটিয়ে বাইজী নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ে গেলেন। মুখে অসীম তৃপ্তি— যেন জীবনস্বপ্ন আজ সার্থক!

গুরুদেবের অশ্রুসজল করুণাঘন আঁখি, শরীর নিশ্চল, যেন ধ্যানস্থ! দাতা ও গ্রহীতা দুজনেই ধন্য। আর যাঁরা চর্মচক্ষে এ দৃশ্য দেখেছেন— এ সংগীত-মাধুরীর রস গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও ধন্য।

শান্তিনিকেতনের কমলাবৌমা। এখানকার প্রাচীন শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র, অধুনা বিশ্বভারতীর কর্মী শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় মহাশয়ের স্ত্রী এই কমলাবৌমা। অল্পবয়সে বিবাহিতা হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন, সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা।

নেপাল রায় মহাশয়ের বৌমা— সেই সূত্রে তিনি এখানে 'বৌমা' নামেই পরিচিতা, এবং বর্তমানে যদিও তাঁরও বৌমা এসে গেছেন, তবুও তিনি শাশুড়ির পদে উন্নীত না হয়ে বৌমাই রয়ে গেছেন।

তিনি তাঁর পূর্বস্মৃতি আলোড়ন করে কিছু বলে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন। তাঁর পনেরো-ষোলো বৎসর বয়সে গুরুদেবকে প্রথম দর্শনের দৃশ্যটি মনে গভীর দাগ কেটে বসে, সেই কথাটিই বললেন। পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বাড়ির সমষ্টি উত্তরায়ণের প্রথম বাড়ি কোণার্ক। সর্বপ্রধান ও বৃহৎবাড়ি উদয়ন— যাতে গুরুদেব পরে বাস করেছেন সেটি তখনও নির্মিত হয় নি। কোণার্কের পাশে প্রকাণ্ড বাঁধানো চত্বর, গুরুদেব সূর্যাস্তের সময় সেখানে বসে দিনান্তের সৌন্দর্য-শোভায় মগ্ন হয়ে যেতেন। নববিবাহিতা পল্লীবালা সরমকুণ্ঠিত পদে তাঁকে প্রথম দর্শন করার আশায় এক অপরাহ্নে সেখানে এসে তাঁর পদপ্রান্তে দাঁড়ালো। সঙ্গিনী কিরণদি ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের সহধর্মিণী। তিনিই পরিচয় প্রদান করায়, গুরুদেব, "এসো বৌমা, এসো, তোমার সঙ্গে এখনও মোটে পরিচয়ই হয় নি" বলে স্মিতহাস্যে প্রণাম গ্রহণ করলেন।

অস্তরবির বর্ণচ্ছটায় অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠা আকাশের পটভূমিকার সম্মুখে গুরুদেবের গেরুয়া-জোব্বা-পরা শ্বেতশ্মশ্রু ও শুভ্র-সুচারু কেশমণ্ডিত অতুলনীয় রূপ দেখে কমলাদেবী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর কেবলই প্রাচীন ঋষিদের কথা মনে পড়তে লাগল। গভীর শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে গেল।

তার পর আরম্ভ হল আলাপ-পরিচয়। গুরুদেব প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের দেশ কোথায়?" কমলাদেবী যশোর জেলায় বলায়, তিনি শিশুর মতো বলে উঠলেন, "আরে— সে যে আমারও দেশ! জান বৌমা, আমার মামার বাড়ি, বাবার বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি সব তোমাদের দেশে।

পাঁড়াগাঁয়ের মেয়ে তুমি, নিশ্চয় রাঁধতে জান!" কিশোরী বধূ লজ্জায় ঘেমে মাথা কাত করল।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "চৈ কচু আর বড়ি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল রাঁধতে পার? আর কুলির অম্বল, মুগির ডাল?"

যশোরের প্রাদেশিক উচ্চারণগুলো এত রসালো করে বললেন যে সকলে হেসে অস্থির। কিশোরী বধূটির লজ্জার বাঁধ সে হাসির তোড়ে বালির বাঁধের মতোই ভেসে গেল।

চৈ দিয়ে কৈ মাছের ঝোল? সে আবার কি? একি শুধুই তামাসা? না চৈ নামে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সত্যই আছে? দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করায় কমলাদি বললেন, "যশোর জেলার একরকম লতা গাছের শিকড় চৈ, এটি রান্নায় দিলে স্বাদও বাড়ে, আর শরীরের পক্ষেও উপকারী। গুরুদেব এই জিনিসটি বড়োই ভালোবাসতেন।"

তিনি পিঠেপুলি মিষ্টান্নেরও খুব সমঝদার ভক্ত ছিলেন। সংযত, মিতাহারী হলেও এ-সব জিনিস অল্প অল্প আস্বাদন করে দেখতে ভালোবাসতেন। শিক্ষক নেপালবাবুকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, "কি হে, তোমাদের পৌষ-পার্বণের আর কত দেরি?" তখন নেপালবাবুর বাড়ি থেকে কমলাবৌমা ও তাঁর শাশুড়ির হাতে-গড়া নানাপ্রকার পিঠে তাঁকে পাঠানো হত।

এই পিঠেরই এক মজার গল্প শুনি।

এখানকার এক ভদ্রমহিলা পিঠে করে গুরুদেবকে পাঠিয়েছেন। কয়েকদিন পর সুবিধামত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গুরুদেব, সেদিন যে পিঠে পাঠিয়েছিলাম, তা কেমন খেলেন?" মৃদু হেসে গুরুদেব বললেন, "নেহাত যখন শুনতে চাইছ, তখন বলি—

লোহা কঠিন, পাথর কঠিন, আর কঠিন ইষ্টক,
তার অধিক কঠিন কন্যে, তোমার হাতের পিষ্টক!"

বাচন-ভঙ্গির সরসতায় উপস্থিত সকলে এত হাসতে লাগলেন যে, ছোঁয়াচ লেগে পিষ্টক-রন্ধনকারিণীও হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

একটু প্রসঙ্গান্তরে আসা হল, পূর্বস্থানে ফিরে যাই। কমলাবৌমাকে গুরুদেব আবার প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের দেশে নদী আছে?" সম্মতিসূচক জবাব পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি নদী?" বৌমা বললেন, "মধুমতী।"

গুরুদেব খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, "বাঃ কি সুন্দর নাম! আচ্ছা, ঐ নদীতে নিশ্চয় অনেক ইলিশমাছ পাওয়া যায়? তুমিও বোধ হয় পাতুরী প্রভৃতি ইলিশের নানারকম শিল্প-চাতুরী জান।"

পল্লীবালা ততক্ষণে সরমের বাঁধ ভেঙে সপ্রতিভ হয়েছেন ও চটপট জবাব দিচ্ছেন। গুরুদেব আবার বললেন, "নদীর দেশের মানুষ, নিশ্চয়ই সাঁতার জান।" বৌমা "হ্যাঁ" বলায় বললেন, "সাঁতার জানা খুব ভালো, কিন্তু এখানে সাঁতার কাটার কোনো ব্যবস্থা নেই, হয়তো তুমি ভুলেই যাবে।"

পরে গুরুদেব শান্তিনিকেতনে একটি সুন্দর 'সুইমিং-পুল' তৈরি করান লালবাঁধের পাশে।

প্রথম দর্শনের সরম-কুণ্ঠা-ভীতি বিসর্জন দিয়ে, দূরত্ব ঘুচিয়ে, অনেক পাওয়ার আনন্দে মন পরিপূর্ণ করে কমলাদি সেদিন বাড়ি ফিরলেন।

সেই অল্পবয়সেই তাঁদের সংসারের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে গুরুদেবের নিকট যাওয়া কমলাদিরও একটা নেশা ছিল। ঐ সময় তিনি সকলের সঙ্গে নানাপ্রকার সরস আলাপ-আলোচনা করতেন। কখনও নিজের লেখা পড়ে শোনাতেন, কখনও রাজনীতি ও স্বাদেশিকতা নিয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতেন, কখনও গ্রাম-উন্নয়ন নিয়ে সারগর্ভ কথা বলতেন। সে সভায় একদিকে যেমন এখানকার জ্ঞানীগুণী অধ্যাপকবৃন্দ যোগ দিতেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের গৃহিণীরাও বাদ যেতেন না; শান্তিনিকেতনে চাঁদের হাট বসে যেত।

এখানে শিক্ষক নেপাল রায় সম্বন্ধে একটি সুবিদিত কাহিনী শুনি। রায়-মহাশয় অত্যন্ত ভালো মানুষ ও শিশুর মতো আপন-ভোলা ছিলেন। কোনো কেয়াবনে কেয়াফুল ফুটেছে, সময়-অসময় নেই, খবর পেয়েই তিনি ছুটলেন কেয়াফুল সংগ্রহ করতে। এ দিকে ক্লাশের সময় বয়ে যায়। ছুটোছুটি করে যখন ফিরে এলেন, ছাত্ররা তাঁর আশায় বসে বসে সমস্ত ঘণ্টাটি কাটিয়ে তখন অন্য ক্লাশে চলে যাচ্ছে। তাই দেখে টাক মাথা চুলকাতে চুলকাতে করুণ সুরে বলতেন, "হ্যাঁরে, তোরা চলে যাচ্ছিস!" এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত ও তিনি তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হতেন।

কখনও খুব উৎসাহের সঙ্গে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের পথ-প্রদর্শক হয়ে আশেপাশের গ্রামে খেজুর রস খাওয়াতে নিয়ে যেতেন ও পথ ভুল

করে ঘুরে ঘুরে নাকালের একশেষ হলে, ছেলেরাই সোজা রাস্তা দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে আসত। স্টেশনে গিয়ে ট্রেন না পাওয়া তাঁর ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

একদিন হঠাৎ তিনি গুরুদেবের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন, 'কাল বিকালে আমার এখানে এসো ও চা পান করে দণ্ড নিও।'

চিঠি পেয়ে চক্ষুস্থির! গুরুদেব কোন্ অপরাধের শাস্তি দিতে চান? না জানি সে কি দণ্ড! হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন বন্ধু নন্দলালবাবুর নিকট। মিনতি করে বললেন, "চলো ভাই, কাল তুমিও আমার সঙ্গে; জানি না কি দণ্ড দেবেন, তুমি পাশে থাকলে তবু একটু ভরসা পাব।" নন্দলালবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "সে কি হয়! তোমাকেই চা-পানে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি কি সেখানে যেতে পারি! সাহস করে যাও, দেখো, কিচ্ছু হবে না।"

রায়-মহাশয়ের মুখচোখ শুকিয়ে এতটুকু, সেদিনের মতো আহার-নিদ্রা মাথায়।

পরদিন যথাসময়ে চা-পানের সময় উত্তরায়ণে গিয়ে গুরুদেবের স্বাভাবিক সৌম্য মূর্তিই দেখেন নেপালবাবু। চায়ের সঙ্গে নানা লোভনীয় আহার্যের সমাবেশ, গুরুদেব তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গিতে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা চালালেন; কিন্তু নেপালবাবুর মুখে যেন সবই বিস্বাদ! ভোজন-বিলাসী সেকালের খাইয়ে মানুষ, কিন্তু গলা দিয়ে কিছুই গলছে না, হৃৎপিণ্ডে ধুকধুকানি— কি জানি কখন ভাগ্যে কি দণ্ডপাত হয়।

দণ্ডের জন্য তিনিও অপেক্ষা করে আছেন, গুরুদেবও সে ধার দিয়েই যাচ্ছেন না— অনেকটা সময় এই যমযন্ত্রণা ভোগ করে, রাত্রি অধিক দেখে রায়-মহাশয় গাত্রোত্থান করলেন। দরজার নিকট যাবার পর গুরুদেব হঠাৎ একটি মোটা লাঠি হাতে নিয়ে কাছে এসে বললেন, "ওহে, এই নাও তোমার দণ্ড! সেদিন যে এখানে ফেলে গিয়েছিলে, সে কথা বুঝি একদম ভুলে গেছ?"

প্রিয় সাথি লাঠিটির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বুকের বোঝা হাল্কা করে হাসি মুখে নেপালবাবু বাড়ি ফিরে এলেন।

আজীবন-প্রবাসী এক বাঙালি মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় পুণা-বাসকালে।

বান্ধবীর দুটি পুত্রসন্তানই বিকলাঙ্গ। দুটিই একপ্রকার— মুখ ও গলা পর্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু তার পর থেকে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অসাড়। বাক্‌শক্তি উত্থানশক্তি বোধশক্তি কিছুই তাদের নেই। সেকালের প্রাচীনপন্থী হিন্দুঘরের মেয়ে হয়েও এবং ইয়োরোপীয় ভাষাজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ঐ অসমসাহসী মহিলা শিশুপুত্র দুটিকে নিয়ে তাদের চিকিৎসার জন্য ইয়োরোপে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন একজন মহারাষ্ট্রীয় ডাক্তার এবং একটি পরিচারিকা।

তাঁর স্বামী পুণায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; জানতেন যে, এ ব্যাধি ভালো হবার নয়। তাই তিনি সময় ও অর্থের অপব্যয় করতে রাজি হলেন না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহিলাটি এ দেশের চিকিৎসায় হতাশ হয়ে বিদেশযাত্রায় বদ্ধপরিকর হন। মায়ের প্রাণ—সর্বস্ব পণ করেও সন্তানের মঙ্গল চায়। মনের কোণে ক্ষীণ আশা, বিদেশের চিকিৎসায় যদি বিন্দুমাত্রও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু হায়! ইয়োরোপের নানা জায়গা ঘুরে বহু বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায়ও কোনো ফল হয় নি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, যাবার সময় জাহাজেই একটি ছেলের প্রাণবিয়োগ ঘটে। তাকে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দিয়ে অতি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি লণ্ডনে পৌঁছান।

গুরুদেব তখন লণ্ডনে। বান্ধবী নির্বান্ধব-পুরীতে স্বদেশের এক মহাপুরুষের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে তাঁকে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। নিজের কথা জ্ঞাপন করে বললেন, "এ দুঃখ আর আমি সইতে পারছি না। কি করে দুঃখকে জয় করা যায়, ভুলে থাকা যায়— আপনি আমাকে তার সন্ধান দিন। আপনি ঋষিকল্প মহামানব, আপনি আমার দুঃখ দূর করে দিন।"

গুরুদেব একটু নিঃশব্দ থেকে ধীরে ধীরে তাঁকে বললেন, "দেখো— একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমার পায়ে এক কাঁকড়া-বিছে কামড়ে দিয়েছিল। কথায় বলে, বৃশ্চিক-দংশন! তার তুল্য যন্ত্রণা আর নেই। রাত্রি গভীর— সকলে ঘুমে অচেতন। কাকে ডাকব? ডেকেই-বা কি হবে? ওরা তো আমার

কষ্টের লাঘব করতে পারবে না; বিষের জ্বলুনি যতক্ষণ থাকে, আমাকে সহ্য করতেই হবে। এই-সব ভেবে আর কাউকে ডাকলাম না। ঘুম দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। ব্যথায় ছটফট করতে করতে মনে হল, আমি কে? ঐ যে যন্ত্রণায় পা-টা অবশ হয়ে আসছে, ঐ পা-টাই আমি? না তো! তবে? তবে কি হাতগুলো আমি? তাও তো নয়! তখন মনে হল—আমি একটি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু; যেই এ কথা মনে হওয়া, অমনি দেখি ব্যথাবেদনা কিছুই আর বুঝতে পারছি না।"

এই সামান্য কটি কথাতেই ভদ্রমহিলা যেন নিজের সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন। গভীর চিন্তা করতে করতে বাড়ি ফিরে এলেন।

একদিন যাই বান্ধবী বীণাদির কাছে। শান্তিনিকেতনে অনেক বীণা— বোধ হয় বীণাপাণির প্রিয় স্থান বলে। এখানকার সকলের মাতৃস্থানীয়া বিবিদি বলতেন, "আমার আশেপাশে চতুর্দিকে কেবল বীণা বাজে।"

এই বীণাদি সুকুমার বসু মহাশয়ের পত্নী এবং অমল হোম মহাশয়ের ভগ্নী। নিজে উচ্চশিক্ষিতা, অমায়িক, মধুরস্বভাব।

তাঁর নিজের কথায় কাহিনীটি বলি—

"খুব ছোটোবেলার একটা কথা মনে আছে। আমার তখন বোধ হয় পাঁচ-ছ বছর বয়স, কারণ বেশ মনে আছে তখনও দ্বিতীয় ভাগের সব যুক্তাক্ষর শেখা হয় নি। অজিতদা (অজিতকুমার চক্রবর্তী, যিনি তখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক ছিলেন) গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন ; তিনি আমার পিতার বন্ধুপুত্র— আমাদের নিজের দাদার মতনই ছিলেন। তিনি সব সময়ই গুরুদেবের গান করেন, কবিতা আবৃত্তি করেন ও গুরুদেবের কথা বলেন। আমার দাদাটি তখন তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে, সমস্তক্ষণ অজিতদার সঙ্গে থাকেন ও অজিতদা তাঁকে কবির কাব্যরসে অভিষিক্ত করেন। থেকে থেকে অজিতদা গেয়ে ওঠেন— 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল'।

তখনকার দিনের ব্রাহ্মকন্যা আমি। 'লক্ষ্মীছাড়া' কথাটা খুব খারাপ, মুখে আনতে নেই বলেই জানি। অথচ অজিতদার গুরুদেব ঐ রকম খারাপ কথায় গান লিখেছেন! মন খুব খারাপ হয়ে যায়। থাকতে না পেরে একদিন অজিতদাকে বললুম, 'আচ্ছা অজিতদা, তোমার গুরুদেব তো খুব ভালো লোক ; তিনি কেন ভালো কথা না লিখে খারাপ কথা লেখেন?' তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! এ কথা কেন বলছিস?'

—'কেন ঐ যে তোমার গান, লক্ষ্মী— তার পর খারাপ কথা'! তিনি খুব হেসে বললেন, 'এক কাজ করো, তুমি গুরুদেবকে একটা চিঠি লেখো ভালো কথা লিখতে।'

মহা চিন্তায় পড়লুম। শ্লেট-পেন্সিল আছে, খাতা-কাগজে তখনও

প্রয়োজন পাই নি। কি করি— দাদামণির লাইন-টানা একটা খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে লিখলুম, 'আপনি আমাকে একটা ভালো কথা লিখে দেবেন।'

অজিতদাকে চুপি চুপি কাগজটা দিলুম। জানি না তিনি কি সব মন্তব্য লিখে পাঠিয়ে দিলেন। খুব শিগগির একদিন আমার নামেই একটা খাম এলো— ভিতরে সাদা চিঠির কাগজে লেখা—

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

অজিতদা কবিতাটা মুখস্থ করিয়ে দিলেন ও মানে বুঝিয়ে দিলেন। তখন এত ছোটো, কি বুঝলুম জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সহি করা চিঠি পেয়েছি— আনন্দে আটখানা হয়ে নেচে বেড়াই।"

তার পর বীণাদির মুখে শুনলাম, চিঠির উপরে ঠিকানা লেখা ছিল শ্রীমতী···। আবার বীণাদি মহা ভাবনায় পড়লেন। ব্রাহ্মসমাজে তখন দস্তুর ছিল অবিবাহিতা মেয়েরা নামের পূর্বে কুমারী ও বিবাহিতারা শ্রীমতী লিখবেন— যেমন ইংরেজিতে মিস ও মিসেসের ব্যবহার হয়। তাঁর খুব ইচ্ছা করতে লাগল যে, স্কুলের সহপাঠিনীদের গুরুদেবের সুন্দর হস্তাক্ষরের লেখা চিঠিখানা গর্ব করে দেখাবেন, কিন্তু বাদ সাধল ঐ 'শ্রীমতী'! লজ্জায় এ চিঠি গোপনে লুকিয়ে ফেললেন।

সমস্যায় পড়ে বড়দাদা অমল হোমকে তিনি বলেছিলেন, গুরুদেব কেন তাঁকে 'শ্রীমতী' লিখলেন? বড়দাদা সুবিধামত গুরুদেবকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। গুরুদেব জানিয়েছিলেন, সমগ্র নারীজাতিই শ্রী, কাজেই প্রতিটি মেয়েই শ্রীমতী।

পরের জীবনে বীণাদি গুরুদেবের বহু সাহচর্য লাভ করেছিলেন। গুরুদেব যত বড়োই হন না কেন তাঁর কাছটিতে যারা এসে পড়ত, তাদের সঙ্গে তিনি এত সহৃদয় ব্যবহার করতেন যে তাদের মনে হত তারা যেন পরমাত্মীয়ের কাছে এসেছে, দূরত্বের ব্যবধান আপনা থেকে দূর হয়ে যেত।

গুরুদেব পিয়ার্সন সাহেবকে লিখেছিলেন—

ছোটোরে কখনও ছোটো নাহি কর মনে।
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে।

যা লিখেছিলেন পিয়ার্সন সাহেবকে— নিজের জীবনের আচরণ দিয়েও সেই একই কথা ব্যক্ত করে গেছেন।

বৈশাখ বৎসরের প্রথম মাস— নূতনকে বরণ করার মাস। আবার রবি-করোজ্জ্বল গ্রীষ্মেরও প্রথম মাস এটি, যেন উগ্র রবিকরে পুড়িয়ে সমগ্র দেশকে শুচিস্মিত করে তোলার মাস। প্রকৃতির পূজারী, কবি প্রথম নয়ন মেলে দেখবেন বলেই কি গ্রীষ্মের নয়নবিমোহন লাল ফুলে ছেয়ে রইলো কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, পলাশ, শিমুল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি? সেইরকম কোনো পঁচিশে বৈশাখে গুরুদেবের উদ্দেশে বীণাদির লেখা—

২৫শে বৈশাখ তাঁর জন্মতিথির বিশেষ দিনটিতে জীবনে চারপাঁচ বার মাত্র তাঁর গলায় মালা দেবার ও পদধূলি মাথায় নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, কি অপূর্ব আনন্দে, শ্রদ্ধায় মন ভরে গেছে; এখন মনে হয়, আরও কেন বেশি করে তাঁর কাছে যাবার সুযোগ খুঁজি নি!

স্কুলে ভর্তি হয়েছি সাত বছর বয়সে— ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে। সেখানে তখন গান শেখান চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী অমলা দাশ। কি মধুর কণ্ঠ! তাঁর কাছে যে গান শিখি, সে সমস্তই রবীন্দ্রনাথের। আমাদের দিয়ে তিনি সেবার প্রাইজের সময় 'শারদোৎসব' নাটক করালেন। সেই-সব গান শিখি, কিছুই বুঝি না কিন্তু ছন্দে সুরে মন আনন্দে ভরে যায়। তার পর একটু বড়ো হলে তাঁকে দেখবার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা! তখন কলকাতায় রামমোহন মৃত্যুবার্ষিকী সভা যে কি বিরাট ব্যাপার হত, যাঁরা তাতে যোগ দিয়েছেন তাঁরাই জানেন। সভাপতি রবীন্দ্রনাথ— তাঁকে দেখতে সে সভায় গেছি গুরুজনদের বহু খোসামোদ করে। সভা লোকে লোকারণ্য, সভাপতির কি চেহারা— কি কণ্ঠস্বর! বক্তৃতা সব বোঝার তখন বয়সও নয়, কিন্তু কি এক আবেশে তাঁকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি। তার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হলে, টাউন হলে, তাঁর কত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনেছি, গল্প পড়া শুনেছি, এখনও যেন মনে লেগে আছে।

তাঁকে দেখেছি 'ডাকঘর' 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটকে। অভিনেতা হিসাবেও তিনি ছিলেন নিপুণ শিল্পী। রঘুপতি-বেশে তাঁকে

দেখার সৌভাগ্য না হলেও ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়সিংহের বেশে তাঁর যে অভিনয় ও রূপ দেখেছি তা আজও ভুলতে পারি না।

কলকাতায় এক-একটা নাটক করতে আসেন, স্টেজের এক পাশে বসেন, কখনো কবিতা পড়েন, কখনও-বা নাটকটি ব্যাখ্যা করেন।

'নটীর পূজা' হল জোড়াসাঁকোর উঠোনে; কবি এসে বসলেন স্টেজের এক পাশে, কি চমৎকার অভিনয়—কি নাচগান! দিনুদা বসেছেন পিছনে গানের দল নিয়ে, নন্দলালবাবুর কন্যা গৌরী 'ক্ষমো হে ক্ষমো' নাচলেন। কলকাতাবাসী স্তম্ভিত, মুগ্ধ!

সেই প্রথম বোধ হয় মেয়েদের কলকাতায় প্রকাশ্যে নাচালেন। কত সপক্ষ বিপক্ষ সমালোচনা নানা সংবাদপত্রে—কিন্তু যাঁরা দেখলেন তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ!

প্রথম দিন দেখে এসে এত ভালো লাগল যে বাবাকে দেখাবার অত্যন্ত আগ্রহ হল। বাবা সেকালের ব্রাহ্ম, উদারচেতা হলেও তখন যেমন শিক্ষিত সমাজ নাচগানকে বর্জন করে চলত, তিনিও তাই করতেন। অনেক চেষ্টায় তাঁকে রাজি করালাম 'নটীর পূজা' দেখতে। বাবা দেখে এসে বললেন, 'যেন ১১ই মাঘের উপাসনায় যোগ দিয়ে এলাম।'

এই ছোট্ট একটু মন্তব্যে বোঝা যায় এ ক্ষেত্রে গুরুদেবের অসাধারণ শক্তি ও অবদান। শিক্ষিত মানুষের মন থেকে মুহূর্তে বহুদিনের সংস্কার খসে পড়ল, নাচগানের মাধ্যমে শুচিশুদ্ধ নির্মল আনন্দ উপভোগ করে কৃতার্থ হল।

তার পর 'তাসের দেশ', 'তপতী', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি নাটকেও গুরুদেবকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে।

গুরুদেবের রচিত বর্ষামঙ্গল অভিনয় হয় প্রথম দিন জোড়াসাঁকোতে। বড়ো বড়ো পদ্ম কেয়াফুল রজনীগন্ধা প্রভৃতি বর্ষার ফুল দিয়ে সভা সাজানো। গেরুয়া সিল্কের আলখাল্লা গায়ে ঋষিপ্রতিম গুরুদেব এসে দাঁড়িয়ে প্রথমে পড়লেন—'হৃদয় আমার নাচে রে, আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে'। শ্রোতাদের মনও যেন সমান তালে বর্ষার উৎসবে নেচে উঠল।

বীণা বসু আরও বলেন—১৯২৭ সালের মার্চ মাসে দোলের সময় বসন্তোৎসবে এসে দু-তিন দিন তাঁরা শান্তিনিকেতনে ছিলেন। গুরুদেব

এখানকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই সময় একটি অতি সুন্দর উৎসবের ব্যবস্থা করতেন, যা আজও চলে আসছে।

গুরুদেব এই সময়ে রচনা করেন বসন্তের নব নব গান। আশ্রম-বালক-বালিকারা বাসন্তী রঙের পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঐ-সব গান গেয়ে ও নেচে প্রভাতে ফাগ ছড়ায় ও সন্ধ্যায় অভিনয় করে বসন্তের নাটক। সব নিয়ে দিনটি মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকে বহুকাল।

তেমনি একটি উৎসব দেখে কলকাতায় ফিরে গিয়ে বীণা বসু গুরুদেবকে লিখলেন— তাঁর নিকট স্বল্পকালের জন্য গিয়েও, কত আনন্দ পেয়েছেন।

চিঠি পেয়েই তৎক্ষণাৎ কবি স্বহস্তে লিখে উত্তর দেন। চিঠিখানার 'ফোটোস্ট্যাট' অন্যত্র প্রকাশিত হলেও চিঠিখানি আবার সকলের দৃষ্টিপথে তুলে ধরি।

কল্যাণীয়াসু,

তোমরা শান্তিনিকেতনে থেকে খুশি হয়ে গেছ শুনে খুশি হলুম। এমনি করেই আমাদের আশ্রমের সঙ্গে তোমাদের হৃদয়ের যোগ হোক এই কামনা করি। ২৫ বৎসরের ঊর্ধ্বকাল প্রায় একলা একলা এখানে নীড় নির্মাণ করতে লেগেছি— এরই শাখায় আমাদের গান, এরই আকাশে আমাদের মুক্তবিহার, এরই পত্রেপুষ্পে আমাদের পূজার অর্ঘ্য রচনা। এই মনে করেই পথ চেয়ে ছিলুম যে, দেশের লোক খুশি হবে। অবশেষে দিন যখন ফুরিয়ে আসে, ছুটি নেবার যখন গোধূলিবেলা এলো তখন তোমরা কেউ কেউ পথিকের মতো তোমাদের জীবনপথের পাশে এখানকার ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছ, বলেছ, খুশি হলে। আমার কানে তোমাদের মুখের এই কথা সন্ধ্যাবেলার পূরবী সুরের মতো শোনালো। তোমরা পথিক চলে গেছ, আমি পথিক, আমার আরো দূরে যাবার সময় এলো। ইতি ১০ই চৈত্র ১৩৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেকালের ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও বিশিষ্ট দিনে আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত পূজনীয় রজনী দাস মহাশয়ের পত্নী, অধুনা শান্তিনিকেতনবাসিনী, আমাদের বর্ষীয়সী স্নেহশীলা মাসিমা শ্রদ্ধেয়া ক্ষীরোদা দাসকে অনুরোধ করায় তিনি বললেন, গুরুদেবকে তিনি তাঁর অতি অল্পবয়স থেকেই দেখে আসছেন। তবে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পর তাঁদের শিলং-বাসকালে গুরুদেব দু-একবার ওখানে গিয়ে তাঁর এক বন্ধুর আবাসে কিছুকাল ছিলেন, সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়।

গুরুদেবের মধ্য-বয়সের চেহারা মাসিমার চোখে ঠিক যিশুখ্রীষ্টের মতো অপরূপ মনে হত।

একদিন মাসিমা তাঁকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। কোলের ছেলেটি পাঁচ-ছ বছরের দুরন্ত বালক। সকলকে সাবধান করে দিলেন যেন খাবার সময়ে মাননীয় অতিথির কাছে গিয়ে সে কোনো বিপ্লব না বাধায়। কিন্তু সকলে যখন পরিবেশন নিয়ে ব্যস্ত, শিশুটি বিদ্যুদ্‌গতিতে সকলের অলক্ষ্যে সেই নিষিদ্ধস্থানেই এসে, নিজের ছোটো চেয়ারখানা টেনে এনে বিজ্ঞের মতো স্থান গ্রহণ করল। কিছুতেই তাকে সরানো যায় না, গুরুদেব বললেন, "থাক্‌, ওকে তোমরা দূরে পাঠিও না।" তবুও মাসিমা তাকে অন্যত্র পাঠাবার প্রচুর চেষ্টার পর অকৃতকার্য হয়ে হার মেনে বললেন, "কি দুষ্টু ছেলে— কিছুতেই কি একে বাগ মানানো যায় না!"

গুরুদেব স্মিতহাস্যে বললেন, "আমি দুষ্টু ছেলেদের খুব ভালোবাসি; একে তোমরা শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিও। এদের মতো দুষ্টুদের জন্যেই আমি আশ্রম করেছি; সারাদিন মাঠে-ঘাটে প্রচুর দুষ্টুমি করবে আর তার সঙ্গে লেখাপড়াও ভালোবেসে শিখবে।"

মাসিমার কন্যারা ইংরেজি স্কুলে পড়ছে শুনে কবি তাদেরও শান্তি-নিকেতনে পাঠিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু স্বামীর চাকুরিস্থল শিলং ছেড়ে অতদূর শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কেমন করে একা থাকবেন বলায় গুরুদেব মুহূর্তে সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বললেন, "ভয় কি?

তোমরা রথীর বাড়ির একপাশে থাকবে, সে-ই তোমাদের দেখাশোনা করতে পারবে, কিচ্ছু ভয় নেই !"

শিলং-বাসকালেই এল তাঁর জন্মদিন। সেদিন ওখানকার বন্ধুবান্ধব সকলকেই তাঁর বাড়িতে নৈশ-ভোজনে নিমন্ত্রণ করা হল। আহারাদির পর অনেকে গুরুদেবকে অনুরোধ করলেন একখানা গান গেয়ে শোনাবার জন্যে। বিনীতভাবে গুরুদেব বললেন, "এখানে দিনু আছে, আরও অনেক গায়ক-গায়িকা আছেন, তাঁদের সামনে কি আমি গাইতে পারি? আর আমার গান তো আমি দিনুকে দিয়ে খালাস। সব ভুলে যাই, সুর একটুও মনে থাকে না। এখন এখানে গাইলে বেসুরো গাইছি বলে সকলে হাসবে।"

তবু একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে গান ধরলেন; কণ্ঠস্বর একটু সরু কিন্তু অসম্ভব মিষ্টি ও জোরালো। গাইতে যখন আরম্ভ করলেন, তন্ময় হয়ে গেয়েই চললেন একটার পর একটা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। শ্রোতারা রুদ্ধনিঃশ্বাসে সে সংগীতসুধা পান করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

সেকালের শিলং-মহিলা-সমিতিতে তাঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করা হল। মাসিমাই 'নাথ হে, প্রেম-পথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও' গানখানি গাইলেন। গুরুদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "বাঃ নির্ভুল সুরে তুমি কি করে এখানে আমার গান শিখলে?" মাসিমা স্বরলিপি থেকে শিখেছেন বলায়, তিনি খুশি হলেন।

মাসিমার একটি কিশোরী কন্যার গান শুনে গুরুদেব এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, যতদিন শিলং-এ ছিলেন, ততদিন আগ্রহের সঙ্গে তাকে তাঁর সংগীত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি শিলং-এর লোকনৃত্য, লোকসংগীত প্রভৃতি প্রাদেশিক সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হবার আগ্রহ প্রকাশ করায় খাসিয়া, নাগা প্রভৃতি পার্বত্য আদিবাসীদের নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি খাসিয়াদের তীরধনুক নিয়ে বীরত্বব্যঞ্জক নৃত্য দেখে প্রচুর আনন্দ পান ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর ঐ আনন্দে আনন্দিত হয়ে শহরবাসীরা বিদায় প্রাক্কালে তাঁকে খাসিয়া তীর-ধনুক উপহার দিয়েছিলেন— যা বোধ হয় এখনও রবীন্দ্র-সদনে সংরক্ষিত আছে।

৯

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্র মহাশয় এখানকার প্রাচীন ছাত্রদের অন্যতম। তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকে ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। পাঠ সমাপ্ত হবার পর দীর্ঘ কর্মজীবন শ্রীনিকেতনে গুরুদেবের আদর্শে কাটিয়ে এখন শ্রীপল্লীতে বাড়ি ক্ষেতখামার গোরুবাছুর প্রভৃতির পরিচর্যায় অবসর-জীবন যাপন করছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। শুনলাম তিনি তাঁর শৈশবে তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে এখানে এসেছেন। গুরুদেবের কথা কিছু জানতে চাওয়ায় অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, "তাঁর মতো মহৎ ব্যক্তির কথা আমার মতো সামান্য লোকের বলা কি সম্ভব?"

তবুও দু-একটি ছোটোখাটো ঘটনা, যা তাঁর মনে আছে শুনতে চাওয়ায়, একটু ভেবে বললেন, যদিও আমি শান্তিনিকেতনে বহুকাল আছি, তবুও গুরুদেবকে কোনো দিন কোনো আহার্য দেওয়ার কথা ভাবতেই পারি নি। এখানকার অনেক মহিলারাই অনেক কিছু মিষ্টি মিঠাই স্বহস্তে তৈরি করে তাঁকে পাঠাতেন। আমি শুনতাম আর ভাবতাম, গুরুদেব পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান— সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা, আহার্য— না জানি কী! বিদুরের ক্ষুদ-কুঁড়ো তাঁকে আর কি দেব? তিনিই বা তা পছন্দ করবেন কেন? তবুও তাঁকে কিছু খাওয়াবার ইচ্ছা যে মনে লুকিয়ে ছিল না, তা বলতে পারি না।

দিন যায়—আমাদের তখন ক্ষেতখামার হয়েছে। গোলা-ভরা ধান-চাল। হঠাৎ একদিন গুরুদেবের পুরাতন ভৃত্য মহাদেব একটি ছোটো কৌটো হাতে এসে বলল, বাবামশাই আমাকে আপনাদের এখানে পাঠিয়েছেন।

কেন? কি ব্যাপার?

আপনাদের ঘরে নাকি ভালো মুড়ি থাকে; আজ তাঁর মুড়ি খেতে ইচ্ছে হয়েছে। তাই আপনাদের কাছ থেকে দুটি মুড়ি নিয়ে যেতে বললেন।

ব্যস্ত হয়ে মহাদেবকে বলি, তুমি একটু আগে কেন বললে না, আমি টাটকা মুড়ি ভাজিয়ে গরম গরম দিতাম।

সে বলে, আমি কি করে জানব বলুন, বাবামশাই তো এখনি বললেন— আর আপনাদের বাড়ি থেকেই নিতে বললেন।

আবেগকম্পিত-বক্ষে ভাণ্ডার খুঁজে অব্যবহৃত পাত্র থেকে এক কৌটো মুড়ি মহাদেবের হাতে দিলাম। মনটা তবু খুঁত খুঁত করতে লাগল যে, টাটকা গরম জিনিসটি দেওয়া হল না ; পরদিন আবার মুড়ি ভাজিয়ে ও ঘরের গোরুর দুধের ছানা থেকে সন্দেশ তৈরি করে দুখানা থালায় সাজিয়ে স্বামীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম উত্তরায়ণে।

গুরুদেব তখন একটু অসুস্থ। নিকটে ছিলেন দৌহিত্রী নন্দিতা। নন্দিতার হাতে থালা দুখানি দেওয়ায় সে বললে, আপনি নিজে গিয়ে দিন, দাদামশাই খুশি হবেন। দ্বিধাগ্রস্ত, কুণ্ঠিতভাবে তিনি ভিতরে ঢুকতেই গুরুদেব 'কি এনেছিস রে, দেখাতো' বলে ঢাকা খুলে দেখে কি খুশি! বললেন, রেখে যা— ওরে এ জিনিস পাওয়া যায় না, সেবা দেব।

গুরুদেবের চরিত্রের একটি দিক যা অন্নপূর্ণাদির মনে উজ্জ্বল, তা হল তাঁর সকলের প্রতি সমদৃষ্টি। সেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, বাল-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ কোনো প্রভেদ ছিল না।

যখনই যে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁর নিকটে যেত, তিনি হয়তো লেখায় মগ্ন, লেখাটি সরিয়ে রেখে বলতেন, "কে—তুমি! আচ্ছা, বোসো বোসো!" মুখে স্মিতহাস্য, বিরক্তির কণামাত্র সেখানে ঠাঁই পেত না। তার পর হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনা। তাঁর এই ভালোবাসা থেকে উত্তরায়ণের বাগানে কর্মরতা সাঁওতাল মেঝেনরাও বাদ যেত না। সাঁওতাল মেয়ে-মজুরদের সাধারণ নাম, 'মেঝেন'।

এই সাঁওতাল মেঝেনেরই এক সুন্দর গল্প শুনেছিলাম। গুরুদেব উত্তরায়ণের চওড়া বারান্দায় এক কোণে টেবিল চেয়ার পেতে লেখায় মগ্ন। এক মেঝেন বাগানের ঘাস পরিষ্কার করে বিকেলে বাড়ি যাবার সময় এসে পাশটিতে দাঁড়ালো ; গুরুদেব মুখ তুলে চাইতেই মেয়েটি বলে উঠল, "হ্যাঁ রে, তুর কি কোনো কাজ নেই? সকালবেলা যখন কাজে এলাম, তখন দেখলাম এইখানে বসে কি করছিস— দুপুরেও দেখলাম এখানেই বসে আছিস—

আবার সন্ধ্যাবেলা আমাদের ঘরে যাবার সময় হয়েছে— এখনও তুই এখানেই বসে আছিস ; তুকে কি কেউ কোনো কাজ দেয় না ?"

গুরুদেব নিজেই সরস ভঙ্গিতে এই গল্পটি করতেন ও সহাস্যে সকলকে বলতেন, "দেখেছ, মেয়েনটার কী বুদ্ধি ! আমার স্বরূপটা একেবারে ধরে ফেলেছে !"

অন্নপূর্ণাদির উত্তরায়ণে উপস্থিতিকালের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা—

এক ভদ্রমহিলা একখানি খাতা হাতে গুরুদেবের ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সাহস করে ভিতরে ঢুকতে পারছেন না। অন্নপূর্ণাদি দেখতে পেয়ে 'কি চাই' জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন, "আমি দূর থেকে এসেছি কবির দু ছত্র লেখার আশায়, পাব কি ?" অন্নপূর্ণাদি বললেন, "চলুন, ঘরে তিনি কাজ করছেন— বলে দেখুন !" বলে তাঁকে গুরুদেবের সামনে হাজির করলেন। গুরুদেব তখন কাগজপত্র ছড়িয়ে নিজের লেখায় মহাব্যস্ত ; কিন্তু আগন্তুক মহিলাটি আসামাত্র "কি চাই ?" বলে মুখ তুলে তাঁর আবেদন শুনলেন ও তৎক্ষণাৎ নিজের কাগজপত্র সরিয়ে মুহূর্তে ভদ্রমহিলার খাতায় চার লাইন কবিতা লিখে দিলেন। মহিলাটি সফলমনোরথ হয়ে গুরুদেবের পদধূলি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

গুরুদেবের অসুস্থতার একটি বর্ণনা অন্নপূর্ণাদি করলেন। সুন্দর সুগঠিত দেহ গুরুদেবের। শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সব সময় পরিচ্ছদে আবৃত থাকত, পার্শ্বচররাও তাঁর মুখমণ্ডল এবং হাত ও পায়ের পাতা ভিন্ন শরীরের অন্য কোনো অংশ কখনও দেখতে পেত না। একদিন তিনি স্নান-ঘরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান ; তখনি তাঁকে ধরাধরি করে এনে নিকটবর্তী একটি বড়ো চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় রাখা হয়। দূরের শয্যায় নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হল না।

তৎক্ষণাৎ খবর গেল কলকাতায়। স্যর নীলরতন সরকার, ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র প্রভৃতি বড়ো বড়ো অনেক ডাক্তার এসে পড়লেন। স্যর নীলরতন দেখেই বললেন, 'ইরিসিপ্লাস্'— এখনই ইঞ্জেকৃশন দেওয়া দরকার। শান্তিনিকেতনে সে ওষুধ পাওয়া যায় না— ভাগ্যক্রমে ডাক্তার সত্যসখা মৈত্রের ব্যাগ খুঁজে ওষুধটি পাওয়া গেল'ও প্রাথমিক চিকিৎসা আরম্ভ হল। দিন

তিন-চার তাঁর আচ্ছন্ন ভাবে কেটে গেল। কিন্তু যেই একটু জ্ঞান হল, কারো কোনো সেবাই আর নিতে চান না; বাথরুম যাওয়া, বেশ পরিবর্তন করা সব নিজে করবেন, অতি দুর্বলতা সত্ত্বেও।

তিনি খুব বড়ো বাড়ি, অট্টালিকা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবন মোটেই পছন্দ করতেন না; সর্বদাই বলতেন, "আমাকে তোরা খুব কম খরচে ছোটো একখানা বাড়ি করে দে।" এইজন্যই 'শ্যামলী' 'পুনশ্চ' 'উদীচী' প্রভৃতি ছোটো বাড়িগুলো তৈরি হয়েছিল।

গুরুদেবের ডাক্তারিবিদ্যার কথাও শুনি। তাঁর ছিল বায়োকেমিক ওষুধের বাক্স, যার যখন প্রয়োজন এসে দাঁড়ালেই অতি মনোযোগের সঙ্গে রোগের বিবরণ শুনে এমন সুন্দর ওষুধ দিতেন যে সকলে তাতেই সুফল পেত।

শ্রীনিকেতনে একটি ছোটো বাড়িতে তখন অন্নপূর্ণাদিরা বাস করতেন, কিন্তু গুরুদেব যখনই এ দিকে আসতেন, কুশলসংবাদ নিয়ে যেতেন। একবার আলুর মরশুমে অনেক আলু কিনে তাঁরা তক্তপোষের নীচে বালি ছড়িয়ে তার ওপর সঞ্চিত রেখেছেন যাতে বর্ষায় চড়া দামে আলু আর না কিনতে হয়। গুরুদেব এসে ঘরে বসে বললেন, "এ কিরে! তোরা এত কাঁঠাল খেয়েছিস যে এত বিচি শুকিয়ে খাটের তলা বোঝাই করেছিস!" বোধ হয় খাটের নীচে প্রায়ান্ধকারে ওগুলো তাঁর কাঁঠালবিচি বলেই মনে হয়েছিল। পরে যখন শুনলেন কাঁঠালবিচি নয়, আলু— তখন কী প্রাণখোলা হাসি!

মাঝে মাঝে তিনি নাকি শ্রীনিকেতনেও কয়েকদিন করে থাকতেন; সেখানে তাঁর বাসস্থানটি ছিল বড়োই অদ্ভুত। একটি গাছের উপরে একখানা কাঠের ঘর, কবিমনের উপযুক্তই বটে! পরে শুনি, এই বৃক্ষস্থিত কাঠের ঘরের বিবরণ। গুরুদেব শ্রীনিকেতনে কাঠের কাজ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার জন্য আনান কয়েকটি জাপানী মিস্ত্রি। বিদেশাগত এই মিস্ত্রিদেরই একজনের হাতের তৈরি ছিল এই অভিনব আবাস। এই ঘরখানায় থাকতে গুরুদেব ভালোবাসতেন। এতে ওঠা-নামা করার জন্য মাটি থেকে ছিল সোজা কাঠের সিঁড়ি।

গুরুদেবের দরদীমনের স্পর্শ-পাওয়া অন্নপূর্ণাদির জীবনের একটি ঘটনার কথা শুনি—

বারো বছরের মেয়ে শান্তি— অন্নপূর্ণাদির প্রথমা কন্যা। স্কুলে যায়; ভালো ছাত্রী, নাচ-গানেও সমান দক্ষতা অর্জন করছে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে গুরুদেব বলেছিলেন, "ওকে তোরা ভালো করে নাচ শেখা— ওর ভিতরে বস্তু আছে।"

একদিন শান্তি আম্রকুঞ্জে স্কুলে গিয়েছে, হঠাৎ কোলাহল উঠল, সে গাছ থেকে পড়ে অজ্ঞান। অন্নপূর্ণাদি ছুটে গিয়ে দেখেন, তাকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুটো ক্লাসের মধ্যে ছুটির সময়টুকুতে সহপাঠিনীদের সঙ্গে গাছে চড়ে কাঁচা আম খেতে গিয়ে এই বিপত্তি! এখানকার বড়ো ডাক্তারবাবু তখন সবে নূতন এসেছেন, দেখে-শুনে প্লাস্টার করে বললেন, "দু-একদিন পর কলকাতায় নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার।" অন্নপূর্ণাদি অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, "যদি কলকাতায় নিতেই হয়, তবে আজই যাব। ডাক্তারবাবু, আপনিও সঙ্গে চলুন।" ডাক্তারবাবুর হাতে অজস্র কাজ, মাথা নেড়ে বললেন, "সে তো সম্ভব হবে না। এত কাজ ফেলে আমি যাই কি করে? আজকের মতো ওকে বাড়ি নিয়ে যান, তার পর ভেবে চিন্তে যা হয় করবেন।"

অন্নপূর্ণাদি নিরুপায় হয়ে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে এলেন। জ্ঞান হওয়ামাত্র শান্তি, 'আমার পা গেল' বলে চীৎকার শুরু করে দিল। বাঁ হাত, বাঁ পা, কোমরের একটা হাড়, সব ভেঙে গেছে। মেয়ের কষ্ট দেখা মায়ের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল, ছুটে গেলেন গুরুদেবের কাছে। সব শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠালেন, ও বললেন, "যদিও তোমার অনেক কাজ, তবুও আজই তুমি শান্তি ও তার মাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসো। এ কাজ সকল কাজের চেয়ে বেশি দরকারি।" তার পর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিচারক মহাদেবকে পাঠাতে লাগলেন, বায়ো-কেমিকের পুরিয়া হাতে দিয়ে। যদি ঐ ওষুধে কষ্টের বিন্দুমাত্র লাঘব হয়।

অর্থের অনটন—'ফ্রি বেডে' ভর্তি—অনেক তদ্বির দরকার, সেজন্য গুরুদেব কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ডাক্তার সত্যসখা মৈত্রের নিকট দিলেন অনুরোধপত্র।

কলকাতায় কারমাইকেল হাসপাতালে মেয়েটি ভর্তি হল এবং বোধ হয় গুরুদেবের চিঠিখানার জন্যই অন্নপূর্ণাদি সুদীর্ঘকাল মেয়ের পাশটিতে থাকার অনুমতি পেলেন।

মেয়াদী কালের পরে প্লাস্টার খুলে দেখা গেল সেটিং-এর ভুলে হাড় ভালো ভাবে জোড়া লাগে নি, মেয়ে হাঁটা-চলা করতে অক্ষম। তখন ডাক্তাররা নিরুপায় হয়ে বললেন, "এতদিন হাসপাতালে আছে ওকে এখন বাড়ি নিয়ে যান, ও কিছুকাল ভাইবোনদের সঙ্গে বাড়ির আরাম উপভোগ করলে আবার মাসকয়েক বাদে নিয়ে আসবেন, আমরা আবার চেষ্টা করে দেখব, কি করতে পারি।"

অন্নপূর্ণাদি নিজের ও কন্যার দুরদৃষ্টে মর্মাহত হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। দু হাতের নীচে দুটি 'ক্রাচ' দিয়ে শান্তি একটু হাঁটতে লাগল। অন্নপূর্ণাদি সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ওষুধ, দৈব, ডাক্তারি, যে যা বলে তাই চেষ্টা করে দেখতে লাগলেন, মেয়েও একটু একটু করে আরোগ্যের পথে পা বাড়াতে লাগল। দুটি ক্রাচের স্থানে একটি ক্রাচ, তার পর ক্রাচবিহীন ভাবে খুঁড়িয়ে একটু একটু হাঁটতে লাগল। পড়াশুনায় বিষম ব্যাঘাত— নাচের কথা তো ভাবাই যায় না। ডাক্তারদের কথামত মাস কয়টি পার হয়ে যাবার পর, আবার অন্নপূর্ণাদি পড়লেন বিষম ভাবনায়। অগতির গতি গুরুদেবের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইলেন, "এখন কি করি ?"

গুরুদেব বললেন, "ও যা আছে তাই থাক্। না-হয় একটু খুঁড়িয়ে হাঁটবে তাতে আর কি হয়েছে ? আমি তোকে মেয়ে নিয়ে কলকাতায় যাবার পরামর্শ দিই না, তবে তোদের যদি ইচ্ছা হয় আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারিস।"

অন্নপূর্ণাদি গুরুদেবের কথা শুনে আর কলকাতায় গেলেন না; আস্তে আস্তে শান্তি প্রায় স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে লাগল। না জানলে তার চলার সামান্য ত্রুটিটুকু আর বোঝা যায় না। বর্তমানে সে বিবাহিতা ও দুটি সন্তানের জননী।

গুরুদেবের শান্তিনিকেতন থেকে শেষ যাত্রার চিত্র একটুখানি পেলাম অন্নপূর্ণাদির কাছে ; দু ধারে আশ্রমবাসী সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন

অশ্রু-সজল চক্ষে, কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, তার মধ্য দিয়ে তাঁকে এনে তোলা হল একটি বাসে শায়িত অবস্থায়। বাস্ চলল কিচেনের পাশ দিয়ে। লম্বা লম্বা খুঁটি পোঁতা হয়েছে—নূতন ইলেকট্রিক লাইট আসবে, তারই অসমাপ্ত তোড়জোড় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত! বাসে শুয়ে গুরুদেব পার্শ্বচরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সব কী?" অনেক দিন অসুস্থ হয়ে নিজের কামরায় আবদ্ধ থাকায় এই কাজগুলোর বিষয় কিছু জানতেন না; সঙ্গীটি সব জানানোর পর বললেন, "তা হলে তোমরা এবার এখান থেকে পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নূতন আলো আনছ!"

তিনি কি তাঁর নিজের কথাই বলে গেলেন? আর তো তিনি এখানে ফিরে এলেন না। কয়েক দিন পর যখন সেই মানুষটির পরিবর্তে এক মুষ্টি ছাই একটি আধারে করে নিয়ে আসা হল তখন শান্তিনিকেতন হাহাকারে ভরে উঠল।

ভস্মাধারটি তাঁর শেষ শয়নকক্ষের প্রাচীরগাত্রে—যেখানে তাঁর পিতা মহর্ষিদেবেরও ভস্মাধার স্থাপিত আছে, সেখানে রক্ষিত হল।

হঠাৎ পরিচিত হই এখানকার প্রাচীনতম শিক্ষক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের কন্যার সঙ্গে। তাঁর বয়স এখন সত্তরের সন্নিকট, রোগশোকের ছাপ দেহে সুস্পষ্ট। সহজ, সরল, অমায়িক ব্যবহার। প্রথম পরিচয়ের পর নামটি জানতে চাওয়ায় বেশ একটু রহস্যের সৃষ্টি হয়। নাম বলতে খুবই লজ্জিত হলেন ও ইতস্তত করতে লাগলেন; পরে জানি, তাঁর পিতৃদেব অত্যন্ত আদরে মেয়ের নাম দিয়েছিলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'! কিন্তু পরের যুগে সে নাম অচল হওয়ায় সংক্ষিপ্ত হয়ে 'দুর্গাদেবী'তে দাঁড়িয়েছে। যাহোক তাঁর মুখে তাঁর স্বনামধন্য স্বর্গগত পিতৃদেবের কথা কিছু শোনা গেল।

দেশ নদীয়ায়, কৃষ্ণনগর স্কুলে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত নবীন জগদানন্দ; জটিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সহজ, সরল মাতৃভাষায় প্রকাশ করে তখনই যশস্বী হয়েছেন— এমন দিনে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বাস-কালে একবার তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এলেন তিনি—অনেক আলাপ-আলোচনা চললো দুজনের মধ্যে। গুরুদেবের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তাঁকে বাহিরের কর্মপাশ ছিন্ন করে টেনে আনলো শিলাইদহের ছোট্ট স্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক-রূপে। এই স্কুলটিকেই বোধ হয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জনক বলা যায়। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত জগদানন্দ এখানে আজীবন বিজ্ঞানাচার্য-রূপে পূজিত হয়ে এখানেই প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করেন। গুরুপল্লির নিজ বাড়ি ও জমিজমা অকাল বৈধব্য-বিড়ম্বিত শিশু-সন্তানবতী এই কন্যা দুর্গাদেবীকে দিয়ে যান।

শ্রদ্ধেয়া দুর্গাদেবীর নিকট তাঁর ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের এক অপরূপ কাহিনী শোনা গেল। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর সভাসদ গোপাল ভাঁড়ের কীর্তিকলাপ কোন্ বাঙালি না জানেন? সেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল একটিমাত্র কন্যা। আদরিণী মেয়ের নাম চাঁদিনী। রূপে গুণে অতুলনীয়া কন্যাটি, বয়সের সঙ্গে চাঁদের মতো ষোলোকলায় যতই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল, মহারাজাও ততই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন। উত্তরাধিকারিণী

এমন মেয়ের উপযুক্ত বর কোথায়? মেয়ে— বিবাহ দিতেই হবে, কিন্তু কোথায় যোগ্য পাত্র?

একটি তরুণ ব্রাহ্মণকুমার টোল খুলেছেন পাশের গ্রামে— মালীপোতায়, নাম চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিকে— সূর্যকিরণের মতো। গুণগ্রাহী মহারাজা তাঁকে সভাপণ্ডিতের আসনে বরণ করতে ইচ্ছুক হয়ে আমন্ত্রণ পাঠালেন।

তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ, যজ্ঞোপবীতধারী দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার যেন অগ্নির ন্যায় জ্যোতিষ্মান; মহারাজকে কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক শুনিয়ে অভিভূত করে গেলেন। বিদ্যুৎগতিতে মহারাজার মনে হয়, এই তো আমার চাঁদিনীর যোগ্য পাত্র, একেই আমি জামাতৃপদে বরণ করব। তার পর সংসারে অনাসক্ত জ্ঞানযোগী ব্রাহ্মণকুমারটিকে অনেক সাধ্যসাধনা করে চাঁদিনীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে নিজের করে নিলেন।

পাঁচখানা গ্রাম জুড়ে তাদের স্বাধীনভাবে আরামে থাকার জন্য বৃহৎ আবাস, জলাশয় ও বহু ধনরত্ন যৌতুক দিলেন। ক্রমে এই দম্পতি অনেক পুত্র-পৌত্র রেখে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করার পর বংশধরদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দারুণ মারামারি, বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। জগদানন্দ রায় মহাশয় ঐ বংশেরই একজন—মামলা-মোকদ্দমা ঝগড়া-বিবাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অংশীদারদের নিজের সমগ্র অংশ দান করে প্রায় এক-বস্ত্রে গৃহত্যাগ করেন ও দরিদ্র স্কুলমাস্টারের জীবন বরণ করেন। কিন্তু অবশেষে স্বোপার্জিত অর্থে শান্তিনিকেতনে ঘরবাড়ি জমিজমা বিষয়সম্পত্তি সবই করেছিলেন।

দুর্গাদেবী তাঁর বারো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনে আসেন। তাঁর নিকট গুরুদেবের কথা শুনতে চাওয়ায় বলেন যে, তিনি যখন তাঁকে প্রথম দেখেন তখন গুরুদেবের দেহ উন্নত, ঋজু, কাঁচা-পাকা চুল ও সামান্য গোঁফ-দাড়ি ছিল। সাদা থান ধুতি কোঁচা দুলিয়ে পরিপাটি করে পরতেন, পায়ে নাগরা জুতো। অল্পবয়সী মেয়েরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে বলতেন— 'তোরা রাঁধতে পারিস তো? ভালো করে রান্না শিখিস।' মহিলারা লাউঘণ্ট, শুক্তানি প্রভৃতি খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জন রেঁধে পাঠালে খুব খুশি হতেন, ও অল্প অল্প খেয়ে দেখতেন।

দুর্গাদেবীর ছোটো বয়সেই বিয়ে হয়েছিল যশোর জেলার কোনো গ্রামে। কিছুদিন শ্বশুরবাড়ি থেকে তিনি যখন শান্তিনিকেতনে আসতেন ও গুরু-দেবকে প্রণাম করতে যেতেন, তিনি রহস্য করে বলতেন, "আমারও শ্বশুর-বাড়ি যশোর জেলায়। ওখানে ভৈরব নদ, কঙ্কণা নদী আছে না রে— ভারী সুন্দর! ও দেশের রান্না বড়ো ভালো আর বড়ি আমসত্বের তুলনা হয় না। ওখান থেকে যখন আসবি আমার জন্যে বড়ি আমসত্ব নিয়ে আসিস— কেমন?"

সদ্যবিবাহিতা মেয়েটি ঘাড় দুলিয়ে বলত, "তা যাই বলুন, ও দেশে যত নদ-নদীই থাক্ আর রান্না যতই ভালো হোক, আমার কিন্তু এই শান্তি-নিকেতনই বেশি ভালো লাগে।"

প্রাণখোলা হাসি হেসে তিনি বলতেন, "ঠিকই বলেছিস, আমাদের এই শান্তিনিকেতনই সবচেয়ে ভালো।"

একটি ছোট্ট ঘটনা তাঁর মুখে শুনি। ঘটনাটি ছোটো কিন্তু এর ভিতর দিয়ে কবির দরদী মনের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

মালদহের এক জমিদারের পাঁচ-ছয় বৎসরের অনধিক একটি শিশুপুত্র শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগে ভর্তি হয়ে খেলাধুলা করে মনের আনন্দে দিন কাটায়; তার জন্মদিনে তার বাবা প্রচুর দই সন্দেশ মিষ্টি মিঠাই লোক-মারফত আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। বোধ হয় কোনো অনিবার্য কারণে নিজেরা আসতে পারেন নি। সেদিন আশ্রমে আনন্দের সাড়া জাগল। শিশুটিকে কেন্দ্র করে সকলেই পেট ভরে মণ্ডা-মিঠাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। ছেলেটিও সকলের সঙ্গে আহার-বিহার আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটালো। রাত্রে শোবার ঘণ্টা পড়লে সকলেই যে যার শয্যায় আশ্রয় নিল।

রাত্রি অনেক— গুরুদেব কিছুতেই বিশ্রাম নিতে পারছেন না, মন চঞ্চল হয়ে উঠল। অত রাত্রে দেহলির উপর থেকে খাড়া-সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বীথিকার পাশ দিয়ে, প্রায়ান্ধকার শিশুবিভাগে ঢুকলেন। গ্রীষ্মকাল, দরজা খোলা, শিশুরা সারি সারি মশারি খাটিয়ে ঘুমে অচেতন। গুরুদেব আস্তে আস্তে চলে গেলেন পূর্বোক্ত শিশুটির পাশে, খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকার পর শুনতে পেলেন, মশারির ভিতর থেকে কান্নার শব্দ! অত রাত্রে মা-বাবার কথা মনে পড়ে শিশুটির চোখের জলে বালিশ ভিজছে। গুরুদেব

জননীর স্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, গল্প বলে, ঘুম পাড়িয়ে তবে সেখান থেকে এলেন।

মাত্র দশ বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন দুর্গাদেবী। ছোটো ছোটো ভাই-বোনদের সমস্ত ভার তাঁরই উপর এসে পড়ে। এর দু-তিন বৎসর পরেই জগদানন্দবাবু দেশ থেকে এদের নিজের নিকট নিয়ে আসেন।

শান্তিনিকেতনে এসে দুর্গাদেবী অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। উদার-হৃদয় রবীন্দ্র-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে অনেক উপকার পেতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা বেলাদেবী তখন বিবাহিতা; মাঝে মাঝে যখন শান্তিনিকেতনে আসতেন, দুর্গাদেবীর ছোটো বোনটিকে অনেক সময় নিজের কাছে রেখে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। বেলাদেবী অতুলনীয় রূপ-গুণের অধিকারিণী ছিলেন, কিন্তু পরিপূর্ণ বিকশিত হবার পূর্বেই ঝরে পড়েন জীবনবৃন্ত হতে।

রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতি— দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী কমলা-দেবীও তখন শান্তিনিকেতনবাসিনী। তিনিও দুর্গাদেবীকে নানা প্রকারে সাহায্য করতেন। গুরুদেব নাতবৌ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেক রসালাপ করতেন। তিনি ডাকতেন 'কমল' বলে—আর রবি ও কমলের সম্বন্ধ নিয়ে মধুর বাক্যচ্ছটায় মুহুর্মুহুঃ তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডল রাঙিয়ে দিতেন।

তৎকালীন আশ্রমের ছোটো বড়ো সকলের বড় মা হেমলতাদেবী মাতৃ-হীনা দুর্গাদেবীরও মায়ের অভাব অনেকটা পূরণ করতেন। তাঁর উদার-হৃদয়ের স্নেহ-স্পর্শে দুর্গাদেবী ধন্যা!

এক ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে জগদানন্দবাবুকে লিখলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রকে তার জ্যাঠাইমার কাছে মুঙ্গেরে পৌঁছে দিতে। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের আজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নী ছিলেন মুঙ্গেরে গঙ্গাতীরে। তিনিই ছিলেন শমীন্দ্রের প্রিয় জ্যাঠাইমা।

শমী শিশুকাল থেকেই একটু রুগ্‌ণ, পেটের অসুখে প্রায়ই ভুগত। চেহারা সুন্দর, লম্বা ফরসা—অনেকটা তার বাবার মতোই দেখতে। এগারো বৎসর বয়স্ক কিশোর বালক শমীন্দ্রনাথকে দুর্গাদেবীর পিতা মুঙ্গেরে রেখে এলেন।

হঠাৎ গুরুদেব সেখান থেকে শিলাইদহে তার-যোগে খবর পেলেন শমী

কলেরায় আক্রান্ত। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথিক-বায়োকেমিক ওষুধপত্রের বাক্স নিয়ে চলে গেলেন মুঙ্গেরে।

শান্তিনিকেতনের সকলে উদগ্রীব হয়ে আছে শমীর সংবাদের জন্য। দুর্গাদেবী এই বালকটিকে নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসতেন। পড়া-শোনার ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টি গলায় গেয়ে উঠত—

'তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার'

সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে উচ্ছল হয়ে হাল্কা দেহে আশ্রমময় লাফিয়ে বেড়াত।

একবার শোনা গেল তার অবস্থা একটু ভালো— গুরুদেব তাকে নিয়ে আসবেন শান্তিনিকেতনে। ভৃত্য বনমালী প্রস্তুত হয়ে আছে অসুস্থ ছোটোদাদাবাবুর যথাসম্ভব আরামের সব ব্যবস্থা ক'রে। পাশের নূতন বাড়িতে দুর্গাদেবীরা সকলে উৎকণ্ঠিত শমীকে দেখার আশায়। অনেক রাত্রে গুরুদেবের গাড়ি এসে থামল দেহলির দরজায়। আশেপাশের সকলে ঘিরে দাঁড়ালো সে গাড়ি। গুরুদেব একাকী সে গাড়ি থেকে নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে একটিও কথা না বলে সোজা চলে গেলেন দেহলির উপর তলায়। তাঁর থমথমে গম্ভীর মুখ দেখে সকলেই বুঝল শমী আর ইহজগতে নেই।

১১

অকস্মাৎ দেখা হল শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী হাসির সঙ্গে। তার স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে পাওয়া গেল দু-এক কণা মণি-মুক্তা।

১৯৩২ সালে হাসি এসেছে আশ্রমের প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীতে যোগ দিতে। ভর্তি হওয়ার হাঙ্গাম চুকে গেলে সে একটি বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল উত্তরায়ণে। বয়স তখন তাঁর সত্তরের উর্ধ্বে, সুদীর্ঘ দেহযষ্টি ঈষৎ বঙ্কিম, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ— ততোধিক উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি বিশাল চক্ষু।

দ্বার অবারিত, মেয়ে দুটি ভীরুপায়ে ভিতরে গিয়ে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করল। গুরুদেব সকল কাজ ফেলে সাদরে বসিয়ে তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করলেন। নবাগতা ছাত্রীটিকে তার পৈতৃক বাসস্থান ও অন্যান্য নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পূব-বাংলার অধিবাসিনী শুনে একটু হেসে বললেন, "দেখেছ মজা— পদ্মার এপারের কেউ এখানে আসে না; তা তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে থাকো এখানে।"

দিন গড়িয়ে যায়, হাসি সমবেত কণ্ঠের গানের দলে স্থান পেল। চলছে 'শাপমোচন' অভিনয়ের মহড়া। গুরুদেব নিজে সকলকে তালিম দিচ্ছেন, এ হেন সময়ে হাসির আঙুলে বুনোকুলের কাঁটা ফুটে এক বিপর্যয় কাণ্ড।

শান্তিনিকেতনের অবারিত মাঠে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বুনোকুলের ঝোপ; গাছগুলি বড়ো কুলগাছের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ— ফলগুলিও তাই। হাতখানেক উচ্চ বামন-বৃক্ষের ফলগুলো ক্ষুদ্রতায় মটরদানার সমকক্ষ— পেকে লাল হয়ে যখন গুচ্ছে গুচ্ছে ঝুলতে থাকে, তখন শোভা হয় বিচিত্র; কিন্তু আস্বাদনে কটু, তিক্ত, কষায়, মিষ্টি— কি যে নয় তা বলা যায় না। তবে ছোটোদের আকর্ষণ করে তীব্রভাবে। সেই আকর্ষণে পড়েই বান্ধবী-সহ হাসির এ দশা! দলের অন্যান্য বান্ধবীরা তৎক্ষণাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সেপটিপিন দিয়ে কাঁটা তুলে দিল, কিন্তু ফল হল সাংঘাতিক! আঙুল বিষিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে গেল হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার, বিখ্যাত শিল্পী রমেন্দ্র চক্রবর্তীর দাদা জিতেন চক্রবর্তীর কাছে। তিনি হাতের

অবস্থা দেখে ছুরী চালালেন ; যন্ত্রণার একটু লাঘব হল, কিন্তু সেই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, ফোলা হাত নিয়েই অভিনয়-দলের সঙ্গে হাসি এলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে। কলকাতার 'এম্পায়ার' রঙ্গমঞ্চে গুরুদেবের উপস্থিতিতে 'শাপমোচনের' প্রথম অভিনয় হবে, তাই তাদের এখানে আসা।

হঠাৎ গুরুদেবের দৃষ্টি পড়ল হাসির হাতে— ব্যাপার কি? সব শুনে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করলেন তাঁকে না জানিয়ে ছুরী চালনার জন্য। তৎক্ষণাৎ নিজের বায়োকেমিক ওষুধের বাক্স খুলে হাসির আঙুলের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। তাঁর হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় ছিল অগাধ বিশ্বাস।

যিনি অস্ত্রোপচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তাঁর জীবনের শেষ দিকে তাঁরই দেহে অস্ত্রোপচার করতে হল।

স্বর্গীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাচীনতম শিক্ষকদের একজন ছিলেন। তিনি জ্ঞানযোগী তপস্বী, সমস্ত জীবন অতি সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করে, প্রায় নব্বুই বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের কঠোর জ্ঞানচর্চার ফল ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত বঙ্গীয় শব্দকোষ ও তৎসঙ্গে নিজের দুটি চক্ষুরত্ন স্বদেশবাসীকে দান করে অমর হয়েছেন। মাত্র তিন বৎসর পূর্বে তিনি যখন প্রায় শতায়ুর নিকটে এসে দেহ রক্ষা করেন, তখনও তাঁর অশীতিপরা সহধর্মিণী জীবিতা। তিনি আজও গুরুপল্লির প্রান্তদেশে, বিশ্বভারতীর ছোটো একখানা বাড়িতে বাস করছেন। পুত্রসন্তান না থাকাতে দু-একটি কন্যা সব সময়ই তাঁর নিকটে থাকেন; কালের স্পর্শে তাঁরাও বার্ধক্যের কোঠায় এসে পৌঁছে গেছেন।

সুযোগ পেয়ে গেলাম তাঁর কাছে পুরানো কথা শুনতে। বয়সের ভারে যদিও মেরুদণ্ড ধনুকাকৃতি, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তবুও তিনি সানন্দে কয়েকটি কথা বললেন। হরিচরণবাবু যখন এখানে শিক্ষকরূপে আসেন তখন সবে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পত্তন হয়েছে, ছাত্র ছিল মোটে ছয়টি। সমবায়-রন্ধনশালায় আহার ও জীর্ণ পাতার কুটিরে বাস, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা— এই করেই তাঁর এ প্রান্তরে দশ বৎসর কেটে গেল; তখনও পরিবার নিয়ে বসবাস করার উপযুক্ত বাড়িঘর এখানে মোটেই হয় নি, গুরুপল্লি কিংবা অন্য কোনো পল্লিই তখনও গড়ে ওঠে নি। কন্যাসহ তিনি দেশেই ছিলেন। হরিচরণবাবু এখানে আসার প্রায় বছর দশেক পরে, কিছু বাড়িঘর তৈরি হওয়ায় তিনি এখানে আসেন ও সেই থেকে এখানেই আছেন। অবশ্য তখনকার গুরুপল্লির বাড়িগুলো সবই ছিল মাটির।

তখনকার শান্তিনিকেতন ও গুরুদেবের কথা জানতে চাওয়ায় বললেন যে, শান্তিনিকেতনের অল্প কয়েকটি শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য সকলের ভিতরে তখন হৃদ্যতা ছিল প্রচুর; অন্তরের যোগে মনে হত সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত। সে জিনিসটি এখন আর এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। গুরুদেব থাকতেন দেহলিতে, তাঁর সকলের সঙ্গেই ব্যবহার ছিল

একেবারে সমান, সে স্বভাবে তারতম্য বলে জিনিসটির কোনো স্থান ছিল না।

তাঁরা ছিলেন সে কালের পর্দানশিনা কুলবধূ। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে শান্তিনিকেতনের অবাধ উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে ক্রমে পর্দার আবরণ আপনি উন্মুক্ত হন। তবুও মাঝে মাঝে লজ্জিত, সঙ্কুচিতভাবে গুরুদেবের দর্শনে গেলে তিনি অতি সহজ ভাবে তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়া কথা আলাপ করতেন ও সমাদর করে কুশল প্রশ্ন করতেন। তাঁর নিকটে যাবার জন্য কারও কোনো সময় কিংবা বিধি-নিষেধের গণ্ডি পার হতে হত না। একদিন তিনি গুরুদেবের বৈকালিক জলযোগের সময় উপস্থিত হয়ে একটু অপ্রতিভভাবে ফিরে যাচ্ছিলেন; কিন্তু পশ্চাতে তাঁর ক্ষীণ পদশব্দ গুরুদেবের কান এড়ায় নি, পিছন ফিরে, "আরে তুমি চলে যাচ্ছ কেন? এসো এসো" বলে সমাদর করে ডেকে এনে সামনে বসালেন ও বললেন, "আমি খাচ্ছি বলে তোমার অত লজ্জা কেন? এই দেখো তোমার সামনে আমি খাব, আমার একটুও লজ্জা করে না।"

একবার কোনো ইংরাজ শাসনকর্তা অথবা সেইরূপ পদস্থ কোনো মাননীয় ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সে উৎসবে গুরুদেবকে গরদের ধুতি-চাদরে সুসজ্জিত দেখে তিনি মুগ্ধ হন।

পরে একদিন গুরুদেবকে বলেছিলেন, "সেদিন ধুতি-চাদরে আপনাকে যা সুন্দর লেগেছিল, তা বলা যায় না; কেন আপনি ধুতি পরেন না? ওতে আপনাকে চমৎকার মানায়।"

গুরুদেব হেসে বলেছিলেন, "তোমরা তো আমাকে ঐরকমই বাড়িয়ে বল। ধুতি পরব কি? কত ল্যাঠা— কে কোঁচায়, কে পাট করে, ঐ-সব দুঃখেই তো বালিশের ওয়াড়গুলো পরে থাকি।" বলে কী প্রাণখোলা হাসি!

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা প্রেমবালা মজুমদার কিছুকাল যাবৎ শান্তিনিকেতনবাসিনী। তিনি এখানকার প্রবীণাদের অন্যতমা—সকলেরই স্নেহময়ী 'মাসিমা', আলাপিনী-মহিলা-সমিতির বর্তমান সভানেত্রী। বয়স যদিও সত্তরের কোঠায় তবুও অত্যন্ত কর্মঠ, স্বাবলম্বিনী, সাহসী ও ধর্মপরায়ণা। মাসিমা মহাত্মা গান্ধীর একজন বিশিষ্ট ভক্ত; কিছুকাল সেবাগ্রামে থেকে মহাত্মার সান্নিধ্যে ও অনুপ্রেরণায় সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ।

তাঁর নিকট গুরুদেব সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন যে, একবার শৈশবে তাঁর গুরুদেবের গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। উপলক্ষ—মহর্ষিদেবের ৮৩ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। শৈশবস্মৃতিতে মাসিমার মনে মহর্ষিদেব ও উজ্জ্বল— অপূর্ব শ্বেতকান্তি, দেবকল্প ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জন্মতিথির সেই বিশেষ দিনটিতে, যে তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল তাকেই একখানা করে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম' নামক পুস্তক বিতরণ করেন। সেখানেই মাসিমা গুরুদেবের কণ্ঠে প্রথম তাঁর নব-রচিত, 'জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী' গানখানা শুনলেন। অতি সুললিত কণ্ঠ, মাসিমার এত মধুর লেগেছিল যে, বললেন ওরকম কণ্ঠস্বর শোনা যায় না।

বহুকাল পাঞ্জাব প্রদেশে বাস করে, জীবনের বহু ঝড় দুর্যোগের ভিতর দিয়ে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে শেষ জীবনে ১৯৪০ সালে দুটি ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য মাসিমা এসে শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে বাস আরম্ভ করেন।

গুরুদেবের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনী মাসিমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুচেতা কৃপালনীর আত্মীয়া ও পূর্ব-পরিচিতা; সেই সূত্রে তাঁর এখানে প্রথম অবস্থান, নন্দিতার বাড়িতে। নন্দিতার সঙ্গেই তিনি গুরুদেবের জীবনসায়াহ্নে তাঁর সন্নিকটে গিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল দ্বাদশ ও চতুর্দশ বৎসর বয়স্কা পুত্র-কন্যাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করা।

গুরুদেব তখন অস্তরবির মতোই ভাস্বর ও জ্যোতির্ময়; সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলেমেয়েদের কোনো বিশেষ বিষয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

আছে কি?" মেয়েটির গলা ভালো, গান শিখতে চায় ও ছেলেটি নাচ ও অন্যান্য বিদ্যা শেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল, শুনে খুশি হলেন।

এর কিছুদিন পর থেকেই গুরুদেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ সময়ে চিকিৎসার জন্য যখন কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, সে দিনটি মাসিমার মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে।

যাত্রার দিনটিতে কিছুক্ষণ আগে থেকেই আশ্রমবাসীতে উত্তরায়ণের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হয়ে গেল। এর মধ্যে ছাত্র শিক্ষক শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ কেউ বাদ গেলেন না। দু ধারের ক্রন্দনরত জনতার মধ্য দিয়ে আরাম-কেদারায় অর্ধ-শায়িত অবস্থায় রোগীকে এনে তোলা হল শান্তি-নিকেতনের বাস্‌টিতে। গুরুদেব ঘন ঘন রুমালে চোখ মুচছেন। মাসিমার কাছে শুনলাম, সেই শেষ সময়কার রোগজীর্ণ শরীরেরও কি অলৌকিক সৌন্দর্য!

সকলে একে একে এসে পদধূলি মাথায় নিল। তিনি পার্শ্ববর্তী একজনকে ধীরে ধীরে বললেন "ভেবেছিলাম শান্তিনিকেতনে শান্তিতে মরব—তা আর ওরা হতে দিল না।" সমবেত সকলকে 'শান্তিনিকেতন' গানখানি গাইতে বললেন। সকলে সমস্বরে নতমস্তকে গানটি গাওয়ার পর ধীরে ধীরে জনতা ভেদ করে শান্তিনিকেতনের প্রাণ, আশ্রমবাসী সকলের স্নেহময় পিতা, রাজর্ষি মহামানবকে চিরদিনের মতো চক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য করে যন্ত্রযান বোলপুর স্টেশনের পথে অগ্রসর হল।

পুরোনো কথা শুনতে হলে ঠানদিকে ধরাই চিরাচরিত প্রথা। সেইজন্য শান্তিনিকেতনের ঠানদির পিছনে ঘুরতে লাগলাম। ঠানদি বললেই যে-চিত্রটি মনের মধ্যে ফুটে ওঠে, যেমন—পাকাচুল, লোলচর্ম দন্তহীনমুখ, নাতি-নাতনি-পরিবেষ্টিতা হয়ে গল্প করা ভিন্ন অন্য কর্মে অক্ষম—এ ঠানদি কিন্তু মোটেই সেরকম নন, বরং তার বিপরীত; বয়স হলেও শক্ত, সমর্থ, কর্মঠ।

তাঁর 'ঠানদি' নামকরণ হয়েছিল শুনেছি বহুদিন পূর্বে, তাঁর খুবই কম বয়সে। এখানকার প্রাচীন শিক্ষক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় গুরুদেবের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯০৮ সালে—এখন থেকে ৫৫ বৎসর পূর্বে। তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া কিরণবালা সেনও তার দু-এক বছর বাদে স্থায়িভাবে এখানে আসেন, ও সেই থেকে এখনও পর্যন্ত এখানেই বাস করছেন।

মাত্র বৎসর দুই পূর্বে পরিণত বয়সে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ক্ষিতিবাবু জাগতিক নশ্বর দেহ ত্যাগ করে আপনার সাধনোচিত ধামে গমন করেন। তাঁর 'ঠাকুর্দা' নামকরণের ইতিবৃত্ত এখানকার অনেকের মুখে শুনেছিলাম।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম দিকে শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি সকলকে নিয়ে গুরুদেব 'শারদোৎসব' নাটকটি অভিনয় করেন। যুবক ক্ষিতিমোহনবাবু তাতে নিয়েছিলেন, ঠাকুর্দার ভূমিকা। সেই থেকেই তিনি হলেন শান্তিনিকেতনের সকলের 'ঠাকুর্দা', কাজেই কিরণদিও সেই অল্পবয়সেই 'ঠানদি' হয়ে গেলেন। পরে ঠানদির নিকট শুনি, ক্ষিতিমোহনবাবুর আজন্ম বাসস্থান কাশীতে অধ্যয়নকালেই তাঁর সতীর্থগণ তাঁর গাম্ভীর্যে ও সারগর্ভ কথাবার্তায় 'ঠাকুর্দা' নামকরণ করেছিলেন। ক্রমে তা শান্তিনিকেতনেও প্রকাশ ও প্রচলিত হয়ে পড়ে।

কালক্রমে ক্ষিতিবাবুর 'ঠাকুর্দা' নাম বিস্মৃতির গহ্বরে লুপ্ত হলেও ঠানদি কিন্তু ঠানদিই রয়ে গেলেন।

শান্তিনিকেতনে সকলের নিকটেই শুনি, ঠানদি এখানকার প্রাচীনতমা গৃহিণী। তিনি অনেক শুনেছেন, অনেক দেখেছেন, অনেক পেয়েছেন, কাজেই

তাঁর গল্পে রবুলিটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অত্যন্ত বৃহৎ। অনেক চেষ্টায় সে ঝুলিটি নেড়ে-চেড়ে যেটুকু পেলাম, তা এই—

গুরুদেব যখন দেহলিতে ছিলেন, তখন ঠানদিরা ছিলেন তার পার্শ্ববর্তী 'নূতন বাড়িতে'। সব সময়ই তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের নূতন নূতন গান শুনতে পেতেন, নিজেদের বাড়িতে বসেই। সেই-সব গান আবার সন্ধ্যায় যখন ছাত্রদের শেখাতেন তখন আশ্রমের সকলেই সেখানে যেতে পারত ও অকুণ্ঠ-ভাবে সে আনন্দের ভাগ নিতে পারত।

প্রতি বুধবার প্রাতে গুরুদেব মন্দিরে সুললিত কণ্ঠে উপাসনা করতেন। সে উপাসনা শুনলে সকলের মনই ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই উপাসনায় যোগ দিতেন, তার মধ্যে পিয়ার্সন সাহেব ও অ্যাণ্ডুজ সাহেবও থাকতেন। তাঁরা ছিলেন গুরুদেবের অত্যন্ত ভক্ত। তাঁদের একজন বাংলা জানতেন না; প্রতি উপাসনার পরে গুরুদেব সেদিনের উপাসনার সমগ্র বিষয়বস্তু সেই আসনে বসেই ইংরাজিতে তর্জমা করে বিদেশীকে বুঝিয়ে দিতেন। গুরুদেবের কণ্ঠস্বর এত জোরালো ছিল যে বাড়ি থেকে ঠানদিরা তা পরিষ্কার শুনতে পেতেন।

গুরুদেবের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রের শৈশবে অকালে প্রাণবিয়োগ ঘটে: সে ছিল দৈহিক সৌন্দর্যে পিতারই অনুরূপ, বোধ হয় বিকশিত হলে, মানসিক সৌন্দর্যেও উত্তরাধিকারী হতে পারত কারণ অতি শৈশবকাল থেকেই তার কবিতা রচনার ও বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অসীম আগ্রহ দেখা যায়। তার হাতে লাগানো একটি মাধবীলতার গাছ ঐ 'নূতন বাড়ির' শোভাবর্ধন করত। সে লতাটি আজও জীবিত, এবং পরলোকগত শিশু শমীর এই স্মৃতিচিহ্নটি খুবই যত্নসহকারে সংরক্ষণের যোগ্য।

অভাবনীয় ভাবে দেখা হয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম যুগের শিক্ষক ও পরে গুরুদেবের কর্মসচিব অজিত চক্রবর্তীর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লাবণ্য দেবীর সঙ্গে। তিনি আবাল্য শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যখন এখানে মেয়েদের শিক্ষাবিভাগের বিষয় ছিল সুদূর-পরাহত, সেই সময়ে বরিশালের বানরিপাড়া গ্রামের গুহঠাকুরতা বংশের কিশোরী লাবণ্য এসে স্থান গ্রহণ করেন গুরুদেবের স্নেহচ্ছায়ায়। গুরুদেব তাঁর দুটি মেয়ে বেলা ও মীরার সঙ্গে যুক্ত করে নেন পঞ্চদশী লাবণ্যকেও।

সেই কিশোরী আজ বার্ধক্য-পীড়িতা—বয়স সত্তরের উর্ধ্বে। জরাগ্রস্ত দেহখানা নিয়ে জীবনসন্ধ্যায় আবার এসেছেন শান্তিনিকেতনের শান্তছায়ায়। তাঁর নিকট গুরুদেব সম্বন্ধে পুরানো কথা শুনতে চাওয়ায় গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম দর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শিলাইদহের পদ্মার চরে বজরাবাসী রবীন্দ্রনাথের দর্শনলাভ তাঁর জীবনের এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। বয়স তখন চৌদ্দ কি পনেরো, কিন্তু তার পূর্ব থেকেই গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে চিঠিপত্রের মাধ্যমে। রবীন্দ্রকাব্য-অনুরাগিনী লাবণ্য দেবী প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃকপ্রকাশিত, 'টালি-সংস্করণের' রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলীর নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন, এবং মাত্র দশ বৎসর বয়স থেকেই কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর চলে পত্র-বিনিময়। কবির 'সোনার তরী' 'মানসী' 'চিত্রা' প্রভৃতির অনেক কবিতাই ঐ বয়সে তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

কবিগুরুর বজরার বিচিত্র গৃহস্থালীর এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া গেল লাবণ্য দেবীর নিকট। শিলাইদহের চরে কয়েকটি বজরা ও নৌকার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তখন গুরুদেবের দুটি কন্যা ও বন্ধুস্বজন পূর্ণ গৃহিণীহীন চলমান সংসার। একটি বড়ো বজরার বিভিন্ন কক্ষে থাকেন গুরুদেব ও তাঁর সঙ্গাভিলাষী বন্ধুবান্ধব। বন্ধুদের মধ্যে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত লোকেন পালিতকে প্রায়ই দেখা যেত।

তার পাশে আর একটি বজরায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা ও কনিষ্ঠা মীরা

বৃদ্ধা রাজলক্ষ্মী দেবীর তত্ত্বাবধানে পদ্মাবক্ষে মনের আনন্দে দিন কাটান।

রাজলক্ষ্মী দেবী কবির স্বর্গীয়া পত্নীর পিতৃগৃহ যশোর জেলার ফুলতলা গ্রামের দূরসম্পর্কীয় পিসি-স্থানীয়া। সেই সূত্রে তিনি কবির পুত্রকন্যার দিদিমা। জ্যেষ্ঠা বেলার বিবাহ অনেক আগেই হয়েছিল, এবং ত্রয়োদশী মীরা তখন নববিবাহিতা। মধ্যমা কন্যা বিবাহিতা রেণুকারানী কিছুকাল পূর্বে অকালে পরলোক গমন করেছেন। নবাগতা লাবণ্য দেবী এসে যেন বয়সের হিসাবেই রাজলক্ষ্মী দেবীর দুই নাতনীর মাঝের শূন্যস্থানটি পূরণ করে মেয়েদের বজরায় স্থান গ্রহণ করলেন।

আর-একটি পান্সী নৌকায় ছিল রান্নার সরঞ্জাম ও পরিচারকদের আবাস। চরে তাঁবু খাটিয়ে কখনও সেখানে রান্না হত, কখনও-বা পান্সীর ভিতরেই হত রান্নার ব্যবস্থা। মেয়েরা মহোৎসাহে চরে নেমে কুট্‌নো কোটা ও রন্ধনকার্যে সহায়তা করতেন। চরের আশেপাশে পাওয়া যেত কচ্ছপের ডিম, টাট্‌কা ইলিশ ও অন্য নানাবিধ মাছ। মেয়েরা তা দিয়ে নানা রকম মুখরোচক ব্যঞ্জন রন্ধনের মহড়া চালাতেন মহা আনন্দে। কিন্তু গুরুদেব নাকি সেই সময়ে ওটমিল, দুধ, ফল ও কিছু কাঁচা শাকসব্জি ভিন্ন বিশেষ কিছুই খেতেন না। লাবণ্য দেবী বলেন— পদ্মার সদ্যধৃত মাছ ও গ্রামের তাজা তরিতরকারি দিয়ে কুঞ্জ ঠাকুরের নানাবিধ পরিপাটি রান্না তখন গুরুদেব প্রায় বর্জন করে চলতেন।

আর-একটি ছিল তড়িদ্‌গতি ছোটো জাপানী বোট। সেখানা জল কেটে ছুটত তীর বেগে। 'তপ্‌সী মাঝি'র তাড়নায় তার কাজ ছিল সকালে কুষ্টিয়া থেকে ডাক নিয়ে আসা ও বিকেলে কবিগুরুকে সান্ধ্য ভ্রমণের আনন্দ দেওয়া। পদ্মাবক্ষে দিনান্তের এই মনোরম জলবিহারে সর্বদাই মেয়েরা সঙ্গে যেতেন ও লাবণ্য দেবী প্রায়ই দেখতেন গুরুদেবের বলিষ্ঠ হাতের দাঁড় টানা। তিনি নিজে নৌকা বেয়ে ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে কন্যাদের নিয়ে বেড়িয়ে আসতে ভালোবাসতেন।

কিশোরী লাবণ্য প্রথম আসেন কুষ্টিয়ার ঠাকুরপরিবারের বিরাট কাছারিবাড়িতে। কিছু সময় সেখানে বিশ্রামের পর অভিভাবক ও পুরাতন পাচক শরৎ দত্তকে নিয়ে পদ্মার শাখা গোরাই নদী দিয়ে আসেন শিলাইদহের চরে গুরুদেবের বজরা-পান্সী-বোটের সংসারে। তখন মধ্যাহ্ন-

ভোজনের সময়— গুরুদেব লাবণ্যকে স্নেহসিক্ত ব্যবহারে স্নিগ্ধ করে সকলের আহার্য পরিবেশনের আদেশ দেন।

সে সময়ে গুরুদেবের বয়স ছিল পঞ্চাশের নীচে— আনুমানিক ছেচল্লিশ অথবা সাতচল্লিশ। ঋজু উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা— কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ ও শ্মশ্রু, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, করুণাঘন মুখশ্রী। লাবণ্য দেবী আশ্রয় নিলেন পিতৃপ্রতিম গুরুদেবের স্নেহাবেষ্টনীর মধ্যে।

সেই রাত্রেই লাবণ্য দেবীর পাচক শরতের হয় কলেরা। পদ্মার চরে কোথায় ডাক্তার, কোথায় কি? গুরুদেবের সঙ্গে থাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স ও বই, তিনি রাত্রিভোর লক্ষণ মিলিয়ে দিতে থাকেন হোমিও-প্যাথিক ঔষধ এবং তাতেই কাজ হয়। শরৎ সে যাত্রা সেরে ওঠে।

তার পর দিন এলো আর এক নিদারুণ খবর। গুরুদেবের মধ্যমজামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর মর্মভেদী দুঃসংবাদে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মধ্যমা কন্যা রানী কিছুকাল পূর্বে পৃথিবী ত্যাগ করলেও এই জামাতাটিকে গুরুদেব পুত্র-নির্বিশেষে স্নেহ করতেন।

লাবণ্য দেবী বলেন— সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে গুরুদেবের মধ্যমা কন্যা রানীর বিবাহ মনে হয় একটু অসাধারণ। সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য তখন মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হলেও ছিলেন গুরুদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। একদিন আকস্মিকভাবে গুরুদেবের নিকট সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রানীর বিবাহপ্রস্তাব আসে। রানী তখন বয়সে একাদশ-বর্ষীয়া বালিকা মাত্র।

রানী শিশুকাল থেকেই রুগ্‌ণ ও দুর্বল, কাজেই গুরুদেবের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল না অত অল্প বয়সে তার বিবাহ দেন, কিন্তু ছেলেটির আগ্রহে শেস পর্যন্ত রাজি হন। তিনি বলেন— বিবাহ এখন হলেও ফুলশয্যা ও পত্নীপরিচয় হবে কয়েক বৎসর পরে। ইতিমধ্যে পাত্রের পড়াশোনা শেষ করতে হবে। সত্যেন্দ্র তাতেই রাজি।

ছেলেমানুষ ছোট্ট রানীর হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল সত্যেন্দ্রের সঙ্গে। বিবাহের পরই গুরুদেব পূর্বের বিধিব্যবস্থা অনুসারে উচ্চ শিক্ষার জন্য সত্যেন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন আমেরিকায়।

এ দিকে রানী দিনে দিনে আরও ক্ষীণ হতে থাকে, ক্রমশঃ প্রকাশ পায় তার ক্ষয়রোগ। তখনকার দিনে ক্ষয়রোগ অথবা যক্ষ্মার বিশেষ কোনো

চিকিৎসাই ছিল না। বহুদিন রোগভোগের পর মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হত নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। রোগের প্রকোপের সঙ্গে রানীর দেহের উত্তাপও বাড়তে থাকে ক্রমশ।

ইতিমধ্যে পরীক্ষা মুলতুবি রেখে সত্যেন্দ্র ফিরে আসেন দেশে। পূর্বের কথামত দুরন্ত রোগাক্রান্ত রানীর জ্বর দেহেই হয় ফুলশয্যা। তার পর ধীরে ধীরে কালের কোলে ঢলে পড়ে রানী। রানীর মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্র বহুদিন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষকতা ও তার সঙ্গে কিছু ডাক্তারি করার পর পুনরায় বিবাহ করেন রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছায়া দেবীকে। নব-পরিণীতা বধূ নিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে এলে উদারহৃদয় গুরুদেব রাজলক্ষ্মী দেবীকে লক্ষ্য করে বলেন, "পিসিমা, রানীর কাপড়চোপড় গহনাপত্র যা আছে সত্যেন্দ্রের বৌকে দিন।" এ বিবাহে গুরুদেব খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু বিধাতার অদ্ভুত বিধানে বিবাহের পর মাস ছয়েকের মধ্যেই সত্যেন্দ্রের জীবনদীপটিও নিভে যায়।

সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো গুরুদেব সমস্ত দুঃখ সহ্য করেন অবিচলিতভাবে। আবার কিছুদিনের মধ্যে অকাল-বৈধব্য-বিড়ম্বিতা ছায়া দেবীর বিবাহ দেন নিজে উদ্যোগী হয়ে। আদি ব্রাহ্মসমাজে এই বোধ হয় প্রথম বিধবাবিবাহ।

পরলোকগতা রানী ও লাবণ্য দেবীর বয়স প্রায় কাছাকাছি বলেই বোধ হয় প্রথম দর্শন থেকেই গুরুদেব তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। লাবণ্য দেবী বলেন— তিনি অল্পবয়সে ক্ষীণাঙ্গিনী ছিলেন। মাসাধিক কাল বজরায় থাকাকালে গুরুদেব তাঁকে ও দুই কন্যাকে নিজের হাতে খাবার ভাগ করে দিতেন। লাবণ্য দেবীর ভাগে সব সময়েই পড়ত পরিমাণে বেশি।

প্রভাতী জলযোগের সময় জননীর মতো গুরুদেবের নিপুণ হাতে একটি বড়ো পাত্রে একটিন গাঢ় বিলাতী দুধ, পরিজ, জ্যাম এবং কলা প্রভৃতি নানাবিধ ফল একত্র করে কাঁটা-চামচের সাহায্যে সুন্দরভাবে মিশিয়ে তিন কন্যার পাতে পরিবেশনের দৃশ্য মনে করে আজও লাবণ্য দেবীর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি পরের জীবনে গুরুদেবের অনেক অনুগ্রহ লাভ করেছেন। বালিকা বয়স হতেই 'পিতঃ' সম্বোধনে চিঠি দিয়েছেন— গুরুদেবও 'মাতঃ' সম্বোধনে জবাব দিয়েছেন।

লাবণ্য দেবী আরও বলেন— তখন গুরুদেবের বজরায় তাঁর উপস্থিতিতে

প্রতিদিন প্রভাতে জমিদারির আমলা-কর্মচারী-রায়ত-প্রজা নিয়ে নিয়মিত বসত কাছারি। জমিদারিতে তখন পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি— তাই গুরুদেব মেয়েদের অতি প্রত্যূষে নদীর ধারে খানিক ক্ষণ বেড়িয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বেই নিজেদের বজরায় ফিরে যেতে বলতেন। প্রত্যেক দিন তাঁরা যখন বেড়িয়ে ফিরতেন পূর্বাকাশে তখন লালের আভাস। গুরুদেব তাঁর বজরার খোলা ডেকে পূর্বাস্য হয়ে বসে ধ্যানমগ্ন, প্রভাতসূর্যের রশ্মি তাঁর মুখমণ্ডলে পড়ে যে অপূর্ব দ্যুতি বিকীর্ণ করত সেই আশ্চর্য শোভার কথা আজও লাবণ্য দেবীর হৃদয়পটে উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত।

সেই সময়ে বজরায় বসে গুরুদেব 'গোরা' উপন্যাসখানি লিখতেন; প্রতিদিন যতটুকু লিখতেন তা মেয়েদের পড়ে শোনাবার পর প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠাতেন।

বড়ো পিসিমা— কবির বড়ো দিদি সৌদামিনী দেবী— রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের প্রাচীনাদের নিকট শোনা গুরুদেবের গার্হস্থ্য জীবনের সেবাপরায়ণতারও একটি চমৎকার চিত্র লাবণ্য দেবীর কথায় পাওয়া যায়। সকলের প্রতি মমতাময় অন্তরটি কবির যেন ছিল সহজাত। পত্নী মৃণালিনী দেবীর শেষ রোগশয্যায় তাঁর অক্লান্ত সেবা অসাধারণ। দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক অসুখে রাত্রির পর রাত্রি জেগে তিনি পত্নীকে হাতপাখায় হাওয়া করতেন। এ কাজটির ভার অন্যকে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নিতে পারতেন না।

মৃণালিনী দেবীর অসুখে প্রথমে চলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা— তাতে বিশেষ উপকার না পাওয়ায় পরে আসেন কবিরাজ। মৃণালিনী দেবীর চিকিৎসার জন্য এলেন তখনকার নামী কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন। আন্ত্রিক গোলযোগে শয্যাশায়ী রোগিনীকে দেখে তিনি মাংসের সুরুয়ার ব্যবস্থা দেন।

কবিপত্নী মাংস কখনোই খেতেন না। গুরুদেব অনেক চিন্তার পর কবিরাজি ওষুধের সঙ্গে মাংসের সুরুয়া দেওয়া স্থির করেন। তখন রোগিনীর অজ্ঞাতসারে সুরুয়া নানা প্রকারে সুবাসিত করে, নিজের হাতে চামচে দিয়ে অল্প অল্প খাওয়ানো আরম্ভ করেন। কিন্তু রোগিনী বুঝতে পেরে বলেন, "তুমি আমাকে কি খাওয়ালে? এ যে মাংসের গন্ধ পাচ্ছি!" তার পর

সেই যে বমি আরম্ভ করেন তা থামানো কঠিন হয়ে ওঠে। এমন-কি পরে মাছের সুরুয়া বা সেই জাতীয় যা খেতেন তাতেই বমি হত। তা ছাড়া গলায় ক্ষত হয়ে রক্তপড়া আরম্ভ হত। দিনে দিনে রোগ আরও বৃদ্ধির পথেই অগ্রসর হতে থাকে।

বহু চেষ্টায়ও মৃণালিনী দেবীকে ধরে রাখা গেল না। অকালেই তাঁকে চলে যেতে হয় স্বামী-পুত্র-কন্যায় ভরা সংসার ফেলে। সেটা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ এবং বয়স মাত্র উনত্রিশ বৎসর; কোলের ছেলে শমীন্দ্র তখন ছয় বৎসরের শিশু। স্বামীর ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিতা বড়ো মেয়ে বেলা ভিন্ন আর সব সন্তানই তাঁর তখন নাবালক।

পত্নীর পর কন্যা। সদ্য মাতৃহারা রানীর দীর্ঘকালব্যাপী অসুখেও গুরুদেব তাকে পিতামাতার দ্বৈত ভালোবাসায় ঘিরে, মায়ের স্থান পূর্ণ করে দীর্ঘ দিন শুশ্রূষা ও বায়ুপরিবর্তনে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি করেন সম্পূর্ণ একাকী। রোগের সঙ্গে সংগ্রাম এবং বিধির বিধান অবিচলিত ভাবে মেনে নেবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন। এই-সব দুঃখের দিনের লেখা কত অমূল্য গান তিনি দিয়ে গেছেন দেশবাসীকে নিজে দুঃখের আগুনে আরও উজ্জ্বল হয়ে।

অজিতকুমার চক্রবর্তীকেও গুরুদেব পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করতেন। কলকাতায় তাঁর অকাল মৃত্যুতে তিনি কঠিন আঘাত পান। শ্রাদ্ধবাসরে নিজে উপস্থিত থাকতে না পারলেও একটি গান লিখে পাঠিয়ে দেন। সেই বিখ্যাত গানটি—'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়, জয় অজানার জয়।'

বোলপুর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধেন্দুরঞ্জন রায়ের সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা অনুপ্রভা রায়। তাঁরা জীবনপ্রান্তে এসে শান্তির আবাস-রূপে বেছে নিয়েছেন শান্তিনিকেতন।

শ্রীযুক্তা রায়ের স্কুল-জীবনে ঢাকায় একবার গুরুদেবের দর্শন ও সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ ঘটেছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। সেখানকার রবীন্দ্রসংগীতের গায়িকা হিসাবে সংগীতস্রষ্টার একেবারে নিকটে যাবার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর; ক্ষণস্থায়ী সেই স্মরণীয় ঘটনা তাঁরই ভাষায় এখানে তুলে ধরি।

১৯২৬ সালের কথা। তখন কতই-বা আমার বয়স, স্কুলের গণ্ডিও পার হই নি, ঢাকায় তুমুল হৈচৈ। পূর্ববঙ্গ সফরে বেরিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আসছেন এই শহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। কবিগুরুর যোগ্য সমাদরের যাতে কোনো ত্রুটি না হয় শহরবাসী সেই আয়োজনে ব্যস্ত। বিশ্বকবির শুভ পদার্পণে ধন্য হবে বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এই শহর।

অনেক উৎকণ্ঠা ও সাগ্রহ প্রতীক্ষার পর অবশেষে এসে পৌঁছল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিনটি—৭ই ফেব্রুয়ারি। অভ্যর্থনাসমিতির ব্যবস্থানুসারে কবিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা হল মোটর-যোগে। সহস্রাধিক নরনারীর এক শোভাযাত্রা মহাসমারোহে তাঁকে নিয়ে এলো বুড়িগঙ্গার তীরে। বিরাট পুরুষের বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে জনতা মূক স্তব্ধ হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমিও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। এতদিন যিনি ছিলেন শুধু কল্পনায় তাঁর এই প্রথম দর্শনলাভে ধন্য হলাম।

শঙ্খধ্বনির মধ্যে চন্দনপুষ্পমাল্যে কবিকে বরণ করা হল। পুষ্পভারাবনত কবি চললেন এগিয়ে, সঙ্গে ছিলেন কবির গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও ছোটো নাতনী 'পুপে' এবং আরও অনেকে।

বুড়িগঙ্গার বিস্তীর্ণ বক্ষে ফুলেপাতায়, আলোয় আলোয় সজ্জিত ছিল একটি লঞ্চ নাম তার 'তুরাগ'। সেখানেই আমাদের মাননীয় অতিথির

বাসস্থান রচিত হল। নদীবক্ষ চিরদিনই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়তো অভ্যর্থনা-সমিতি এই ব্যবস্থাই করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে, ঢাকা ম্যুন্সিপ্যালিটির তরফ থেকে, পিপ্‌লস্ অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হল, সংবর্ধনা জানানো হল।

একদিন ঢাকা মহিলাদের পক্ষ থেকে 'দীপালি' সংঘের আয়োজনে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির-প্রাঙ্গণে কবিকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। প্রায় দুই হাজার মহিলা ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কবির ভাষণ ও আবৃত্তি শুনে সবাই অভিভূত। তাঁর অপূর্ব সুললিত কণ্ঠস্বর, তেজোদৃপ্ত ভাষা শুনে মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে রইলাম। কিই-বা তখন বয়স আমার, বুঝিই-বা কতটুকু, তবু মন্ত্রাবিষ্টের মতো এই মহিমময় বিরাট পুরুষকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখি ও তাঁর মধুক্ষরা বাক্য শ্রবণ করে কৃতার্থ হই।

সেই সময়টিতে ঢাকায় 'রবীন্দ্র-পরিষৎ' বা 'রবীন্দ্র-সংসদ' নামে একটি সাহিত্যচক্র ছিল বলে মনে পড়ছে। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, তাঁর ছোটো ভাই শ্রীঅনিলকুমার চন্দ — যিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী, আমার দুই কাকা শ্রীনির্মলচন্দ্র নাগ, শ্রীঅমলচন্দ্র নাগ প্রভৃতি এই সাহিত্যচক্রের সদস্য ছিলেন। এঁরা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। এঁদেরই উদ্যোগে এক সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অপূর্ব চন্দ মহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গণে কবিগুরুর সংবর্ধনার আয়োজন করা হল। এই উপলক্ষে আরও অনেকের সঙ্গে আমারও ডাক পড়ল গানের দলে যোগ দেওয়ার জন্য। ইতিপূর্বে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বা শহরের ছোটোখাটো অনুষ্ঠানে গান গেয়েছি কিন্তু এই বিরাট প্রতিভার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো এমন সম্পদ তো আমার কিছুই নেই, তবু ডাক যখন পড়েছে যেতেই হবে। গান ঠিক করবার ভার নিলেন কবি স্বয়ং— শেখাবার ভার অবশ্য পড়লো দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। গানের দলে আমরা আট-দশ জন ছিলাম ছেলেমেয়ে মিলে। মনে পড়ে আমার কাকারা, মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী ইন্দুদিও ছিলেন, এঁরা বোধ হয় শান্তিনিকেতনেরই প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী। যে কটি গান কবি নির্বাচন করলেন, তার প্রথমটি—'হে

ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া', আর শেষ গানটি 'কে বলে যাও যাও— আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া'। মাঝে আরও কয়টি গান ছিল। আমরা তখন ছোটো ছিলাম বলেই হয়তো আবার গানের অর্থটি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন 'আমি তো তোমাদের কাছে ক্ষণিকের অতিথি, তাই ওটা প্রথমে গেয়ে আমাকে তোমরা সংবর্ধনা জানাবে, আর শেষ গানে, আমার যাওয়ার সময় হল কিন্তু তোমরা আমায় যেতে দিতে চাও না, এই ভাব।' আরও একটা গান শেখানো হল আমাদের 'না, যেয়ো না, যেয়ো-নাকো মিলন-পিয়াসী মোরা' একই অর্থে।

নদীবক্ষে 'তুরাগে' তিনি বসে আছেন তাঁর আরাম-কেদারায়, পায়ের কাছে নীচে আমরা কয়েকটি মেয়ে তাঁকে ঘিরে বসে আছি। একটি গান আমাদের তিনি নিজেই শেখালেন তখন—'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো'। নির্ভয়ে তাঁর কাছে একেবারে আপনজনের মতো বসে গানটি শিখলুম, কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, কি অপূর্ব সুরের মূর্ছনা, এখনও যেন সে মূর্ছনার রেশ কানে বাজে। গান শেখা হয়ে গেলে আমাদের তিনি কৌতুক করে সরস মধুর হেসে বললেন, "দেখো, তোমরা যেন আবার গেয়ো না, বেদানায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা।" শুনে আমাদের কি মজাই লাগল, সবাই খুব হাসলুম। আবার কিছু ক্ষণ পর হঠাৎ তাঁর দিকে তাকাতেই দেখি মৃদু মৃদু হেসে মাথা একটু দোলাচ্ছেন, বললেন, "উঁহু, ঢাকাই মেয়েরা দেখছি একেবারেই কাজের নয়, ঢাকাই মশারা কিন্তু বড়োই কাজের— কি রকম নিরলস পদসেবা করছে!"

সংবর্ধনা সভার দিন প্রতিমা দেবীর নির্দেশে আমরা মেয়েরা পরলাম বাসন্তী রঙের লালপাড় শাড়ি আর ছেলেরা পরলেন বাসন্তী রঙের ধুতি পাঞ্জাবী ও উত্তরীয়। আমাদের চুল সযত্নে বেঁধে খোঁপায় ফুল দিয়ে সাজিয়েও দিলেন প্রতিমা দেবী নিজেই। সংবর্ধনার আগে আমরা গানের দল কবির সঙ্গে ছবি তুলবো এ রকম কথা ছিল, তিনিও তাই জানতেন কিন্তু অন্য জায়গায় একটি অনুষ্ঠান শেষ করে আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল, দিনের আলো নিভে এলো, তাতে নাকি কবি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন ও নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়াতে একটু বিরক্তও হয়েছিলেন। যা হোক আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য যে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে ছবিটি ধরে রাখার কথা

ছিল তা আর হল না। তবে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মাঝখানে বসিয়ে আমরা একটি ছবি তুলেছিলাম। কবি সেদিন আমাদের গান শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন ও আমাদের বলেছিলেন, "চলো শান্তিনিকেতন গিয়ে থাকবে, গান শিখতে পারবে অনেক।"

যাবার ক্ষণ এল, নীরবে অটোগ্রাফ খাতাখানি নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। শ্রীঅনিল চন্দ মহাশয় ভিড় ঠেলে আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, ভীরু কম্পিত বক্ষে খাতাখানি তুলে দিলাম কবির হাতে, মৃদু হেসে তখনি লিখে দিলেন—'গানের ঝরনা-তলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে'—

কবি চলে গেলেন। মনটা বেদনায় ভরে গেল। দুর্ভাগ্য আমার, তাই সময়মত শান্তিনিকেতন গিয়ে তাঁর পদচ্ছায়ায় বসে গান শেখবার সুযোগ আর হল না। যখন এলাম শান্তিনিকেতনে, তখন রবি অস্ত গেছেন, আমারও জীবনসন্ধ্যা। কিন্তু জীবনপ্রভাতে তাঁর দুদিনের সাহচর্যে যে অপরিমিত উৎসাহ পেয়েছি তাই আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের পাথেয়।

এর পরে আর একটিবার মাত্র সেই দুর্লভ জ্যোতির্ময় রূপ দেখার,—সেই অপূর্ব মধুর কণ্ঠস্বর শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'তপতী' অভিনয় দেখতে গিয়ে। কবি স্বয়ং রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, রানীর ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্তী—বর্তমানে ঠাকুর। বিপাশার ভূমিকায় তাঁরই ছোটো বোন সুমিতা। নাট্যমঞ্চে কবিকে দেখা এই আমার প্রথম ও শেষ। সে যে কি অনুভূতি তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই— সে-সন্ধ্যায় আমার সমস্ত দেহ-প্রাণ-মন যেন একটি নমস্কারে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল প্রাঙ্গণের সুদূর প্রান্ত থেকে।

আজ আর নয়নসম্মুখে তিনি নেই, স্মৃতির তুলিতে শুধু ছবি আঁকা আছে চিত্তপটে ; নিভৃতে বসে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আশ মেটে না।

গুরুদেবের শেষজীবনের সঙ্গী ও তাঁর রচনার অনুলেখক—বিশ্বভারতীর কর্মী শ্রীসুধীরচন্দ্র কর মহাশয়ের বর্ষীয়সী জননী শ্রদ্ধেয়া কামিনীসুন্দরী কর। বয়স আনুমানিক পঁচাত্তর—কিন্তু এই বয়সেও বেশ কর্মক্ষম, রন্ধন ও গৃহকর্মে যথেষ্ট পারদর্শিনী। এখনও পুত্রকন্যা পুত্রবধূ নাতি-নাতনী সম্বলিত একটি বড়ো সংসারের হাল দৃঢ়হস্তে ধরে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করছেন।

তাঁর ছেলেমেয়েরা সকলেই শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ছাত্রী-আবাসস্থিতা প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থিনী কন্যা সাধনা কর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কামিনী দেবী ফরিদপুরের সুদূর পল্লিগ্রাম থেকে এখানে আসেন, —সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের কথা। নিচু-বাংলার নিকট একটি বাড়ি ভাড়া করে তিনি থাকেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে, পরিপাটি করে রেঁধে খাওয়ান সন্তানদের—পাড়াপ্রতিবেশীও তা থেকে বাদ পড়েন না। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর রন্ধনপটুতার কথা।

সুধীর কর মহাশয় তখন গুরুদেবের কাছে থাকেন—যখন যা বলেন, তৎক্ষণাৎ লিখে নেন। একদিন গুরুদেব তাঁকে বললেন, "ওহে, শুনলাম তোমার দেশ থেকে তোমার মা এসেছেন। খুব যত্ন করে যে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন তা তো তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে—তা বেশ ভালোই হয়েছে।"

অল্পবয়সী সুধীর কর মহাশয় অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলেন, "মার ইচ্ছা—তিনি আপনাকেও একদিন রেঁধে খাওয়ান।"

গুরুদেব স্মিতহাস্যে বলেন, "উত্তম প্রস্তাব।"

কর-মহাশয় উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি গিয়ে মাকে বললেন, "মা, কাল তুমি গুরুদেবের জন্য কিছু রান্না করে পাঠিয়ে দাও।"

মা বলেন, "আমি তো বিলিতি রান্না কিছুই জানি না, তিনি কি আমার এই পাড়াগেঁয়ে রান্না পছন্দ করবেন?"

কর-মশাই বলেন, "দেশী রান্নাই গুরুদেব পছন্দ করেন; তুমি আমাদের সাধারণ দেশী রান্না ঝাল-মশলা কম দিয়ে রেঁধে দাও, দেখো, গুরুদেব খুব খুশি হবেন।"

পরদিন তিনি রাঁধলেন সুক্তোনী, ঝিঙে-পাতুরী, মাছের মুড়োর ডাল, কচি আমের পাতলা ডাল, মাছের ঝোল, পাটিসাপ্টা ও রসমাধুরী।

চৈত্র মাস—বেলা দশটাতেই রৌদ্রের খুব তেজ; জুতো পরতে অনভ্যস্তা সেকালের পল্লিজননী, পরিচারকের হাতে সব সাজিয়ে দিয়ে নিজেও তার সঙ্গে চললেন নগ্ন পদে উত্তরায়ণে।

গুরুদেবের খাবার সময়—তিনি মাত্র খাবার টেবিলে এসে বসেছেন—পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী একপাশে দণ্ডায়মানা, পাচক তাঁর নিয়মিত আহার্য এনে দিয়েছে, এমন সময় কামিনীসুন্দরী দেবী সেখানে পৌঁছলেন। গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনি আবার এই রোদ্দুরে এত কষ্ট করে নিজে কেন এলেন? দেখুন তো, এ মোটেই ঠিক হয় নি।"

কামিনীসুন্দরী দেবী পরিচারকের হাত থেকে আহার্য সব একে একে টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ আপনার বাড়ির খাবার নাই-বা খেলেন, এগুলোই একটু চেখে দেখুন।"

"নিশ্চয়ই" বলে গুরুদেব তাঁর বাড়ির খাবার সরিয়ে দিয়ে সেই সুক্তোনী, পিঠে-পায়েস পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তার পর নানা সহৃদয় প্রশ্ন—নূতন জায়গায় এসে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না ইত্যাদি। গুরুদেব তাঁর রান্না খেয়ে এত খুশি হয়েছিলেন দেখে এর পর থেকে কামিনীসুন্দরী দেবী মাঝে মাঝে কিছু-না-কিছু রান্না করে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। রান্নার মধ্যে দু-এক রকমের মাছের তরকারি সর্বদাই থাকত, কিন্তু পরে যখন শুনলেন গুরুদেব মাছ বেশি পছন্দ করেন না, তখন তিনি বেশির ভাগ নিরামিষ রান্না ও পূর্ববঙ্গের পিঠে পুলি করে দিতেন ও তিনিও তা খেয়ে খুব সন্তুষ্ট হতেন।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ১লা বৈশাখ। তার আগের দিন গুরুদেব বলে পাঠালেন—"কাল কয়েকটি বন্ধুবান্ধব খাবে—ঘি তেল আনাজপাতি চাল ডাল সব উত্তরায়ণ থেকে যাবে, কিন্তু রেঁধে দিতে হবে।"

কামিনীসুন্দরী দেবী সানন্দে সম্মত হলেন; পরদিন সকাল থেকে কোমর বেঁধে কত কি রাঁধলেন। তিনি রান্নার মামুলি জিনিসের অতিরিক্ত চেয়েছিলেন একটি নারকেল। সেই নারকেল দিয়ে রাঁধলেন অপূর্ব মিষ্টান্ন। তা ছাড়া তেতো শুক্তো, ঝিঙে-পাতুরী, বিট গাজর প্রভৃতি অসময়ের মহার্ঘ্য তরকারির

ডালনা, লাউঘণ্ট, চিঁড়ে দিয়ে মুড়িঘণ্ট, মাছের রসা, কালিয়া, আমের অম্বল ইত্যাদি অনেক রকম। গুরুদেব বন্ধু-স্বজন সঙ্গে নববর্ষে ফরিদপুরের পল্লিবাসিনীর হাতের সযত্ন রান্না খেয়ে যেমন পরিতৃপ্ত হলেন, তেমনি কিংবা ততোধিক পরিতৃপ্ত হলেন রন্ধনকারিণী।

শিশু-বিভাগের কণাদি। পঁচিশ-ত্রিশটি বাঙালি, অবাঙালি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন প্রকৃতির, ছয় থেকে দশ বৎসর বয়স্ক শিশু নিয়ে কণাদির সংসার। একদল যায়, অন্যদল আসে। এ ভাবে সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর এদের তত্ত্বাবধান করে, জীবনের প্রান্তদেশে উপস্থিত হওয়া যে কতটা সহ্য ও ধৈর্যের পরিচায়ক তা সহজেই অনুমেয়।

একদিন বিকেল চারটায় শিশু-বিভাগ-সংলগ্ন কণাদির ঘরে গিয়ে দেখি, একটি শিশু নিয়ে তিনি মহা ব্যস্ত— চোখ মুখ ধুইয়ে তাকে নিয়ে ঘরে এলে, জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই ছোট্ট ছেলেটির মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। দেখলাম, মায়ের অধিক যত্নে কণাদি শিশুটির নাকে গ্লিসারিন ও তুলো ঢুকিয়ে বললেন, "এবার যাও, লক্ষ্মী হয়ে খেলা করো গে, গাছে চড়া, মারামারির ধারেও যেয়ো না।"

যে ঘণ্টা দুই সেখানে ছিলাম, তারই ভিতরে দেখি, এমনি পাঁচ-সাতটি শিশু একটু আদর পাবার কিংবা মনোযোগ আকর্ষণ করার আশায় কণাদির আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। কেউ বলে, হাত কেটেছে— কেউ বলে, পেটে ব্যথা লেগেছে—কেউ বলে, সাথি মেরেছে। আবার একটি ক্ষুদে ছেলে হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, "বাগানের মধ্যে বল পড়ে গিয়েছে— খুঁজে পাচ্ছি না।" কণাদি কাউকে উপদেশ দিয়ে, কাউকে ষাট্ বলে, কারুর গায়ে হাত বুলিয়ে, কাউকে-বা ওষুধ লাগিয়ে বিদায় করলেন। ছুটির ঘণ্টায় এই সমবয়সী বালকদের ঝগড়া মারামারি, কান্নাকাটি, কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতির আর অন্ত থাকে না।

এতগুলো শিশুর ধোপা-নাপিতের ব্যবস্থা থেকে জামায় বোতাম লাগানো, ঝগড়া মেটানো, খেলাধুলোয় কাছে থাকা, শয়ন, পঠন, আবার সপ্তাহে একদিন দূরবর্তী অভিভাবকের নিকট চিঠি লেখানো প্রভৃতি, দুজন ভৃত্য ও একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ভারই বর্ষীয়সী কণাদির উপর। দিনের প্রধান খাওয়া ওরা যদিও সাধারণ রন্ধনাগারে খায় তবু দু বেলার দুধ, জলখাবারে কণাদির স্নেহসিক্ত হাতের পরশ পেয়ে খুশি

হয়। কণাদিও আবার নিজের থেকে মাঝে মাঝে বাচ্চাদের এটা-সেটা খাবার করে খাইয়ে তৃপ্তিলাভ করেন।

একটি-দুটি আপন সন্তান মানুষ করা কতই কষ্টকর, আর এই নিঃসন্তান বিধবা মহিলা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে সমস্ত জীবন পরের ছেলে হাসি মুখে মানুষ করে যাচ্ছেন দেখে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত হয়ে গেল।

তাঁর নিজের সম্বন্ধে ও গুরুদেব সম্বন্ধে, তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাওয়ায় অতি ব্যস্ততার মধ্যেও, সসংকোচে যেটুকু বললেন, তা এই—

নাম তাঁর শ্রীযুক্তা সুশীলাবালা দত্ত। কিন্তু এ নাম শান্তিনিকেতনে প্রায় অজানিত। তাঁর শিশুকালের ডাক নাম 'কণা'ই সকলের পরিচিত। আশ্রম-শিশুরা তাঁকে বলে মাসিমা। বহু কাল পূর্বের কথা। স্বামী সরকারী চাকুরে, সুগায়ক, তৃষিতচন্দ্র দত্ত তখন একক জীবন যাপন করছেন শিলংএ। একান্নবর্তী বড়ো পরিবারের বধূটি তখনও যান নি প্রবাসে, স্বামী-সান্নিধ্যে। দেশে পাঁচ জনের মধ্যে নিজের কর্তব্য পালন করে যান, এমনি সময়ে একবার শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহনবাবু সপরিবারে শিলং যান; তাঁর বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা, সহজ সরল জীবন-যাত্রা-প্রণালী ও সুরেলা কণ্ঠের মধুর গানে মুগ্ধ হয়ে তৃষিতবাবু তাঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন, ও গুরুদেবের নূতন নূতন গান অতি আগ্রহে তাঁর নিকটে শিখতে থাকেন। সেই থেকে উভয়ে অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এর কিছুকাল পরেই স্বামীর আকস্মিক পরলোকগমন কণাদিকে বিহ্বল করে তোলে। তখন বন্ধুপত্নীর নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ক্ষিতিবাবু তাঁকে একবার শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং এই পৃথিবীতে করবার মতো কত কাজ আছে তার নানারূপ আভাস দিয়ে কণাদির নিরানন্দ মনে একটুখানি আনন্দের ছোঁয়া লাগান। সেই আমন্ত্রণে কণাদি আনুমানিক ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবের দর্শন পান। সেবারে কোনোই কথাবার্তা হল না, শুধু গুরুদেবকে দর্শন করে তিনি বাড়ি ফিরে যান।

এ দিকে গুরুদেব ও ক্ষিতিবাবুর মধ্যে আলাপ-আলোচনায় কি স্থির হল জানা নেই, কিন্তু কণাদি ক্ষিতিবাবুর মারফত সংবাদ পেলেন যে, গুরুদেব শিশু-বিভাগের জন্য তাঁকে চান।

শুনলাম, সে সময় শিশু-বিভাগে কোনো মহিলা ছিলেন না। শুধু দাস-দাসী ও শিক্ষক তাদের কচি মনের মায়ের অভাবটি পূর্ণ করতে অপারগ, সে কথা গুরুদেব বোধ হয় অনুভব করেছিলেন। সে সময় তিনি নাকি বলতেন, 'আমরা শিশুদের শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু তাদের মাতৃস্নেহের ক্ষুধা মেটাবো কি করে? উপযুক্ত মানুষের অভাবে এ বিভাগটি বোধ হয় তুলেই দিতে হবে। তা ছাড়া আরও অসুবিধা, সম্পূর্ণ মাইনে-করা লোক দিয়ে তো এ কাজ হবার নয়।'

এমনি দিনে কণাদিকে দেখে তাঁকেই বোধ হয় এ কাজের উপযুক্ত মনে করে ক্ষিতিবাবু মারফত ঘন ঘন তাগিদ পাঠাতে লাগলেন, শীঘ্র এসে এ কাজের ভার নেবার জন্য।

কণাদি সেকালের গৃহস্থবধূ, এ ভাবে কাজ করা দূরে থাক্, কখনও নিজের গণ্ডির বাইরে যান নি; অনেক ইতস্তত করে এ দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা নিজের আছে কি না সে বিষয়ে বিষম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অবশেষে গুরুদেবের আহ্বানে সাড়া দিলেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। গুরুদেব দেহত্যাগ করার মাত্র তিন-চার বৎসর পূর্বে এসে তাঁর শিশু-বিভাগের ভার নিলেন ও সেই থেকে সুষ্ঠুভাবে এ কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের অসুস্থতা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা সত্ত্বেও। বয়স যদিও এখনও সত্তর হয় নি, তথাপি শরীর সে তুলনায় অনেক জীর্ণ।

কর্মভার গ্রহণ করেও তাঁর মনের দ্বন্দ্ব ঘোচে না, এক দিন গুরুদেবকে গিয়ে বললেন, "আপনার যে কাজ মাথায় নিলাম, তার কি উপযুক্ত আমি? কোনো বোর্ডিং-হোস্টেল চালাবার মতো বিদ্যা বা অভিজ্ঞতা তো আমার নেই, আমি কি পারব এ কাজ চালাতে?" গুরুদেব বললেন, "কে বলছে তোমাকে বোর্ডিং-হোস্টেল চালাতে? আমি তো সেরকম গতানুগতিক বোর্ডিং-হোস্টেল তৈরি করি নি; তুমি শিশুদের মধ্যে থেকে একটুখানি বাড়ির আবহাওয়া সৃষ্টি করো, শিশুরা যেন মনে করে মার বাড়ি থেকে মাসিমার বাড়িতে এসেছে—মনে যেন তাদের কোনো দুঃখ না থাকে, তা হলেই তোমার কর্তব্য পূর্ণ হবে।"

বুধবার এখানে ছুটির দিন, সেদিন কণাদি শিশুদের নিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করতে যেতেন উত্তরায়ণে। গুরুদেব শিশুদের দেখে খুশি হতেন ও

নিজের হাতে তাদের প্রত্যেককে লজেন্স, টফি দিতেন। কণাদিকেও শিশুদের সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন। তার মধ্যে কণাদির এখনও যা মনে আছে তা বর্ষা সম্বন্ধে। গুরুদেব বলতেন, "শিশুদের কিন্তু মনের আনন্দে বৃষ্টির জলে ভিজতে দিও, আর পার তো তুমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিও। বর্ষার জলে অসুখ করে না—শরীর ভালো হয়।"

আরও বলতেন, "আমার ছেলেদের সুন্দর সুন্দর গল্প বোলো, কিন্তু দেখো, তারা যেন কোনো প্রাদেশিক উচ্চারণ না শেখে। তাদের স্বাভাবিক খেলাধূলায় বাধা দিও না, তবে দৃষ্টি রেখো যেন হাত-পা না ভাঙে।"

কণাদি এখানে প্রথম আসার পর গুরুদেব তাঁকে সাধারণ রন্ধনশালায় খেতে বলেছিলেন, কিন্তু স্বপাক ভিন্ন অন্য কিছু আহার না করায় কণাদি নিজের ঘরটিতেই অনেকদিন রেঁধে খেয়েছেন। বহু বৎসর পরে তাঁর আঙিনায় একটি রান্নাঘর-জাতীয় ছোটো ঘর নির্মিত হল।

গুরুদেব এবারে কণাদিকে আরও একটি কাজের ভার দিলেন, নবনির্মিত ঘরটিতে 'ডোমেস্টিক সায়েন্সে'র মেয়েদের হাতে-কলমে রন্ধনশিক্ষা দিতে হবে প্রতি বুধবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে। এ কাজের ভারও কণাদি সানন্দে গ্রহণ করলেন। মেয়েরা মহা আনন্দে রান্না ক'রে দু-একটি অতিথিভোজন করাত ও গুরুদেবকেও কিছু-কিছু রন্ধনবিদ্যার পরিচয় দিয়ে আসত। এই প্রসঙ্গে গুরুদেব কণাদিকে শিক্ষার্থিনীদের চপ, কাটলেট, মাংস প্রভৃতি ব্যয়বহুল রান্নার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি-ঘরের সাধারণ রান্নাগুলোও ভালোভাবে শেখাতে বলতেন।

একবার গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে কণাদি গুরুদেবকে প্রণাম করতে গেলেন একাকিনী। গুরুদেব তখন ছিলেন শ্যামলীতে; এক কোণে বসে তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছেন। তাঁর সেই রোগজীর্ণ-বার্ধক্যেও হস্তের দ্রুত-সঞ্চালন দেখে কণাদি স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

ক্ষণ পরেই গুরুদেব তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে নিকটে আহ্বান করলেন। কণাদি প্রণাম করে বললেন, "সামনের ছুটিতে কলকাতা যাচ্ছি, তাই প্রণাম করতে এলাম।" গুরুদেব আশীর্বাদ করে বললেন, "সাময়িকভাবে যাচ্ছ যাও, কিন্তু এ স্থান যেন কখনোই ত্যাগ কোরো না।" বলতে বলতে আজ আবেগে কণাদির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

এর পর থেকেই গুরুদেব ক্রমশ অসুস্থ হয়ে চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু দিনে একবার তাঁর আশ্রম পরিদর্শন না করলে ভালো লাগে না, তাই চক্রযুক্ত চেয়ারে বসিয়ে মন্দির অথবা আম্রকুঞ্জ পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনা হত। শিশু-বিভাগ একটু দূরে, সে পর্যন্ত আর নিয়ে যাওয়া হত না। সে চক্রযুক্ত চেয়ারে বসে তিনি আম্রকুঞ্জে শিশুদের সাহিত্য-বাসরে যোগ দিতেন, তাঁকে ঘন বৃক্ষের ছায়ায় শিশু-পরিবৃত হয়ে এমন মানাত যে আম্রকুঞ্জ সেদিন যেন সজীব হয়ে উঠত। শিশুদের প্রতি তাঁর যে কি গভীর মমতা ছিল, তা তাঁর সামান্য দু-একটি কথায় পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়। তিনি বলতেন, "শেষ জীবনটা আমি উত্তরায়ণে না থেকে দেহলিতে থাকব। ওখান থেকে সব সময়েই আমার চপল শিশুদের দেখা যাবে।" তাঁর আর একটি অন্তিম ইচ্ছা যা আর পালন করার সময় হয়ে ওঠে নি, তা তিনি চলৎশক্তি হারাবার পর প্রায়ই বলতেন, "আমাকে একটা বলদ-টানা 'পুস্‌পুস্‌' জাতীয় গাড়ি করে দাও, তাতে করে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াব।"

কণাদির সঙ্গে এই-সব কথাবার্তার কিছুদিন পরেই তাঁকে চলে আসতে হয় কলকাতায়। এবং অল্পদিনের মধ্যেই শেষনিশ্বাস ফেলেন।

শান্তিনিকেতনের প্রাচীন ছাত্র, গুরুদেবের প্রিয়পাত্র, স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী শ্রীমুকুল দে মহাশয়ের পত্নী, শ্রদ্ধেয়া বীণা দে। চিত্রশিল্পীর বাড়ির নাম 'চিত্রলেখা'। একদিন সেখানে যাই বীণাদির নিকট কিছু শোনার আশায়।

সৌজন্যপূর্ণ-ভাবে বললেন যে, তিনি আশৈশব রবীন্দ্রকাব্য-অনুরাগিনী ও তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষিনী। মুকুলবাবুর সঙ্গে পরিণীতা হবার পর গুরুদেবকে প্রথম দর্শন করেন একটি জাপানী জনসভায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার 'নিপ্পন'-ক্লাবে এক বিরাট সভায় জাপানের এক সুবিপুল ঘণ্টা উপহার দেওয়া হয় বৌদ্ধ-কৃষ্টি-কেন্দ্র সারনাথে। কবিগুরু ছিলেন সে সভার প্রধান অতিথি।

মুকুলবাবু তখন কলকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ। সস্ত্রীক আমন্ত্রিত হয়ে সে সভায় গুরুদেবের সঙ্গে নবপরিণীতা বধূকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সান্নিধ্যে যান। নববধূর নাম বীণা শুনে গুরুদেব আনন্দিত হয়ে মধুর রহস্যে বললেন, "সে কি রে তুই বীণা দিয়ে কি করবি? বীণা তো আমার এলাকায় পড়ে।" তার পর "বোসো আমার পাশটিতে" বলে সযত্নে পাশে বসিয়ে বললেন, "তোমাকে যে আমার অতি পরিচিত মনে হচ্ছে—আবার দেখা কোরো।"

এর পরের দর্শন শান্তিনিকেতনে। গুরুদেবের বাসস্থান উত্তরায়ণে। এবারেও গুরুদেব সাদরে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি রাঁধতে জান?" গৃহস্থকন্যা, রন্ধনপটু বীণাদি সলজ্জ ভাবে 'হ্যাঁ' বলার সঙ্গে মনে মনে স্থির করলেন গুরুদেব যখন রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁকে একদিন রেঁধে খাওয়াতে হবে।

গুরুদেব কি কি জিনিস খেতে ভালোবাসেন, স্বামীর নিকট তার সন্ধান নিয়ে জানলেন, তপসে মাছ, চন্দ্রপুলি ও আইস্‌ক্রিম তাঁর অতি প্রিয়। এর অধিকাংশই শান্তিনিকেতন তথা বোলপুরে দুষ্প্রাপ্য; এমন-কি তখন এখানে বরফ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু বীণাদির এই জিনিসকটি খাওয়াবার এত আগ্রহ হয়েছিল যে কলকাতা থেকে আইস্‌ক্রিমের যন্ত্র, বরফ, তপসে মাছ সংগ্রহ করে নিজের হাতে সযত্নে রেঁধে উত্তরায়ণে নিয়ে গেলেন স্বামীসহ।

তখন কোণার্কবাসী গুরুদেব সব দেখে খুব খুশি ; কিন্তু পরিমাণ সম্বন্ধে বললেন, "তোমরা আমাকে কি ভেবেছ ? আমি কি এত খেতে পারি ? তোমরাও আমার সঙ্গে বোসো।" কিন্তু কৃতী ছাত্রটি গুরুদেবের প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে বললেন, "ওটুকু তো আপনার জন্যই আনা— আমাদের অংশ বাড়িতে প্রচুর আছে।" তখন গুরুদেব— "অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে, তোমরা বাড়ি গিয়ে খাও, আমার এখানে বৌমা আছেন"— বলে তাঁদের পিতার মতো স্নেহে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। বীণাদির মনে কিন্তু সামনে বসে খাওয়াতে না পারার একটু আপশোষ রয়ে গেল।

কিছুকাল পর চার বৎসরের শিশুকন্যাটি নিয়ে বীণাদি মাঝে মাঝে যেতেন উত্তরায়ণে গুরুদেবকে প্রণাম করতে। শিশুটি কিছুতেই মাথা নিচু না করায় তিনি হেসে বলতেন, "আহা, থাক্-না, কেন ওকে বিরক্ত কর। মাথাটা উঁচু করেই থাকতে দাও পৃথিবীতে, যতদিন পারে।" তার পর দু হাত ভরে লজেন্স বিস্কুট দিয়ে আদর করতেন। বীণাদি বলতেন, "এই মেয়ে আপনার আশ্রমে পড়াশুনা করে গড়ে উঠবে।"

সে সময়ে তাঁরা কলকাতাবাসী হলেও কিছুকালের মধ্যে স্থায়িভাবে এসে শান্তিনিকেতনে বাস আরম্ভ করেন এবং সুদর্শনা, সুশীলা কন্যাটি এখানকার স্কুলের নিম্নশ্রেণী থেকে এম. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে কৃতকার্য হয়ে এখন 'ডক্টরেটের' জন্য বিশ্বভারতীর বৃত্তিধারিণী কৃতী ছাত্রী।

একদিন বীণাদি গিয়েছিলেন গুরুদেব-দর্শনে জোড়াসাঁকোয়। সেদিন ঘরখানা তখনও নির্জন। সুযোগ পেয়ে বীণাদি একটি প্রশ্ন করলেন, "যা চাওয়া যায়, তা কি পাওয়া যায় ?"

গুরুদেব গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "তা যায়, আকাঙ্ক্ষা আন্তরিক হলে পাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়— খানিকটা।" বীণাদি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "চাওয়াটা কি দোষের ?" তিনি বললেন, "মোটেই নয়।"

"তা হলে কেন গীতায় লিখেছে, কিছু চাইতে নেই, মনকে রাখতে হবে নিষ্কাম ?"

"চাইতে হবে— কিন্তু সম্বস্ত। না চাইলে কিছুই পাওয়া যায় না।"

বীণাদির অনেক দিনের মানসিক দ্বন্দ্ব নিরসন হল— মনের পেয়ালা সুধাবিন্দুতে ভরে গেল।

শ্রীযুক্তা ননীবালা রায় শান্তিনিকেতনের প্রাচীনাদের অন্যতমা। তিনি বালবিধবা— বহুকাল পূর্বে একটি শিশুকন্যাসহ এখানে আসেন বড়োমা শ্রদ্ধেয়া হেমলতা দেবীর সঙ্গে পরিচিতি-সূত্রে। স্নেহপ্রবণা বড়োমা তাঁকে সমর্পণ করেন গুরুদেবের হাতে, তিনিও সানন্দে তাঁকে যথাযোগ্য কাজে নিযুক্ত করেন।

ননীবালাদির মনে হয়, বিভিন্ন মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোঝার একটা অসাধারণ ক্ষমতা গুরুদেবের ছিল। তিনি যাঁর যেখানে স্থান, সেখানেই তাঁকে আসন দিতেন।

ননীবালাদি যখন এখানে এলেন, বয়স তখন ত্রিশের নীচে— মন সংসারে বীতস্পৃহ— একমাত্র বন্ধন— কিশোরী কন্যাটি। এখানকার বিদ্যালয়ে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়ে কিছুকালের মধ্যেই গুরুদেব ননীবালাদিকে নিযুক্ত করলেন সুরুল গ্রামে তাঁর নবপরিকল্পিত সমাজকল্যাণ-কর্মে। এ কাজে অগ্রণী ছিলেন উদারচেতা শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ মহাশয়।

গুরুদেব প্রাণকেন্দ্র— তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশী-বিদেশী অনেকেই এগিয়ে আসতে লাগলেন এই পরোপকার-যজ্ঞে তাঁকে নানা প্রকারে সাহায্য প্রদানের পূত-সংকল্পে। সেদিনের সেই মহাপ্রাণদের শ্রমদান, অর্থদান, সহানুভূতিদান প্রভৃতিতে পরিপুষ্ট হয়ে এসে নব অঙ্কুরটি আজ শাখাপ্রশাখা-পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে শ্রীনিকেতনে পল্লি-শিক্ষণ-কেন্দ্রে পরিণত।

ননীবালাদি প্রমুখ আরও দু-চারটি পরোপকারিণী মহিলাদের নিয়ে গড়ে উঠল নারী-উন্নতিমূলক গ্রামসেবাকেন্দ্র। গুরুদেবের উপদেশমত তাঁরা আশে-পাশের গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার জন্য শ্রীনিকেতনে স্থাপন করলেন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের কাজ প্রাতঃকালে সীমাবদ্ধ, মধ্যাহ্নে বয়স্কাদের জীবন-শিক্ষা-দান ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করে শোনানো প্রভৃতি গ্রাম্য কুলবালাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিমূলক কাজ; এর সঙ্গে যুক্ত হত মাতৃমঙ্গল,

শিশুমঙ্গল, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সব কাজ।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এই পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা মহিলা কয়জনের আর নিশ্বাস নেবার ফাঁকও থাকত না। গোড়ার দিকে তাঁদের আবার অনেক হাসি-টিট্‌কারিও শুনতে হত—যাঁদের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন তাঁদেরই নিকট থেকে। মনে দুঃখ হলেও দমে পড়তেন না শুধু গুরুদেবের আশীর্বাদে ও কালীমোহনবাবুর আশ্বাসে। কালীমোহনবাবু বলতেন, "তোমরা কাজ চালিয়ে যাও, থেমো না, দেখো পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের নিঃস্বার্থ সেবার মর্ম বুঝে, ওরাই আবার তোমাদের গলায় মালা দেবে।" এ বাক্যও অল্প সময়ের মধ্যেই সফল হয়েছিল। মাঝে মাঝে ননীবালাদি গুরুদেব-সকাশে এলে তিনি অতি আগ্রহে গ্রামের সংগঠনমূলক কাজের খবর নিতেন। গ্রাম-উন্নয়ন কার্যে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম, এ জন্য বহু চিন্তা করতেন, অনেক সুপরিকল্পিত নির্দেশ দিতেন। গুরুদেব ননীবালাদিকে বলতেন, "তোমরা প্রতি গ্রামে যদি একটি মেয়েকেও যথার্থ শিক্ষিতা করে তুলতে পার, তবে তাকে দিয়েই আবার সেই গ্রামে অনেক কাজ হবে। বহুজনকে ভাসা-ভাসা শেখানোর চেয়ে, উপযুক্ত একজনকে ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া অনেক বাঞ্ছনীয়।"

সেই সময়ে মিস্ গ্রীন নামে এক মার্কিন মহিলা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এই গ্রাম-সেবাকর্মে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধাত্রী-বিদ্যা-পারদর্শিনী; কাজেই ঐ দিকের কাজগুলো কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। ক্রমে তাঁর দেশে ফিরে যাবার সময় এল, কিন্তু তাঁর স্থান পূরণ করবে কে? গুরুদেব চিন্তিত হলেন; অনেক চেষ্টায় একটি সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করে ননীবালাদিকে কলকাতার 'ইডেন' হাসপাতালে রেখে, মাতৃমঙ্গল কার্যে সুশিক্ষিতা করিয়ে আনেন। তার পর ননীবালাদি বহুদিন—প্রায় বারো বৎসর ঐ কাজ সুনামের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। এখন সেবাপল্লির নিজ বাটীতে কন্যা জামাতা নাতি নাতনী পরিবৃতা হয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছেন। শান্তিনিকেতনে আসার প্রাক্কালে যে কন্যাটি ছিল রিক্তা শিশু—সে আজ মানসিক ঐশ্বর্যশালিনী, পুত্রকন্যার জননী, বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তীর্ণা, বোলপুর স্কুলে শিক্ষাদাত্রী পরিপূর্ণা নারী।

ননীবালাদির নিকট আরও পাই, গুরুদেবের শোকসন্তপ্ত চিত্তের একটি

করুণ চিত্র। গুরুদেবের প্রথমা কন্যা 'বেলা' শয্যাশায়িনী। রোজ প্রাতঃকালে গুরুদেব জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে একটু দূরে জামাতৃসদনে যান মেয়েকে দেখতে ও সেখানে প্রিয়তমা কন্যার রোগশয্যার পাশে কিছু ক্ষণ কাটিয়ে আসেন; মেয়ের অবস্থা ক্রমশই ডাক্তারদের আয়ত্তের বাইরে, দ্রুত অবনতির পথে— এমন দিনে এক প্রভাতে গিয়ে শোনেন— সব শেষ, প্রাণাধিকা বেলার পৃথিবীর খেলা চিরদিনের মতো সমাপ্ত! শুনেই চলে এলেন নিজ বাড়িতে। মুখে কথা নেই, আঁখিতে নেই অশ্রু, সোজা ঘরে প্রবেশ করে বসলেন যোগাসনে। সেই ধ্যানগম্ভীর মূর্তি দর্শন করে বাড়ির আত্মজনেরা নিকটে যাওয়া দূরে থাক্, সে ঘরটিতে প্রবিষ্ট হতেও ভীত সন্ত্রস্ত। ক্রমে বেলা বাড়ে, আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু তিনি পাথরের মূর্তির মতো একাসনে বসে।

অনেক ক্ষণ এ ভাবে বসে থাকার পর উঠে এলেন সহজ মানুষ হয়ে। বাহ্যিক শোকের প্রকাশ তাঁর কখনোই দেখা যেত না যদিও জীবনে তাঁকে অনেক প্রিয়-বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের প্রাচীনা গৃহিণীদের অন্যতমা মনোরমাদি। সহজ সরল প্রাচীন মানুষটি— উদারচেতা, মাতৃভূমির একনিষ্ঠ ভক্ত, পরোপকারী শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহধর্মিণী।

সহৃদয়া মাতৃসমা মহিলা বললেন, তিনি তাঁর প্রথম পুত্র সুগায়ক— বর্তমানে সংগীত-ভবনের রবীন্দ্র-সংগীত-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের ছয় মাস বয়সে এখানে আসেন— সে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের কথা।

কালীমোহনবাবু বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের অগ্নিময় যুগের বীর যোদ্ধা। দেশমাতৃকার আহ্বানে, অশেষ দুঃখ বরণ করার সম্ভাবনা মস্তকে নিয়ে তিনি কলেজী শিক্ষা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন জননীর সেবার দীন ভৃত্যরূপে।

গ্রামে গ্রামে সুবক্তা কালীমোহনবাবু ঘুমন্ত দেশবাসীকে স্বাদেশিকতায় জাগ্রত করার সাধনায় নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে কিছুকালের মধ্যেই স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েন। সেই সূত্রে গিরিডিতে গিয়ে এক ডাক্তারের মাধ্যমে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয়ের সূচনা। তার পর এই ভগ্নস্বাস্থ্য খাঁটি মানুষটিকে গুরুদেব নিয়ে আসেন তাঁর শান্তিনিকেতনে।

তখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম অধ্যায়, গুরুদেব তাঁকে নিযুক্ত করেন শিশু-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরূপে। তিনিও সানন্দে শিশুদের আপন পুত্রের অধিক যত্নে প্রতিপালন করতে ও শিক্ষা দিতে লাগলেন।

সুদূর পূর্ববঙ্গবাসিনী কিশোরী বধূ মনোরমাদি শান্তিনিকেতনে আসেন কালীমোহনবাবু আসার দু-তিন বৎসর পরে। যেদিন প্রথম এখানে এলেন, তার পরদিনই স্বামী বললেন যে, শিশু-সন্তানটি নিয়ে যেতে হবে গুরুদেব-দর্শনে। পল্লিবধূর মহা মুশকিল— একে একগলা ঘোমটা, তার উপর বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ! ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। কালীমোহনবাবু বললেন, "ঘোমটা কমাতে হবে, এখানে ওটা অচল, গুরুদেবের কাছে যেতেই হবে বিকেলে।"

মনোরমাদি অপরাহ্নে ছ'মাসের হৃষ্টপুষ্ট শিশু শান্তিদেবকে কোলে নিয়ে দুর্গানাম স্মরণ করে চললেন স্বামীর পিছু পিছু।

গুরুদেব তখন থাকেন মন্দির-সংলগ্ন শান্তিনিকেতন-ভবনে। কালীমোহন-বাবু সস্ত্রীক প্রণামাদি করে বসার পর, গুরুদেব শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মোটা-সোটা গোলগাল, কালো কুচকুচে ছেলেটি, মাথায় কোঁকড়ানো চুলের রাশি। হাতে গলায় সোনার গহনা, কোমরে কোমর-পাটা, শিশুটির দিকে খানিক দেখে গুরুদেব কালীমোহনবাবুকে বলে উঠলেন—"বাঃ! এই তোমার ছেলে? এ যে কৃষ্ণ-ঠাকুর! খুব সুন্দর।"

তার পর মনোরমাদির লজ্জা সংকোচ দূর হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। গুরু-দেবের গানে, আবৃত্তিপাঠে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে রান্না-খাওয়া তুচ্ছ করে ছুটে যেতেন সংগীতসুধা পান করতে। তখন দিনুবাবু গান শেখান; গুরুদেবের বর্ষার গানগুলো তাঁর মুখে অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠত। বর্ষার দিনে তিনি একবার গান শুরু করলে সেদিনের শান্তিনিকেতনের সকলে ছুটে আসত সম্মোহিত হয়ে নিজের কাজ ফেলে। দিনুবাবুও অসাধারণ গায়ক, একবার আরম্ভ করলে অক্লেশে গেয়ে যেতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

নাটকাদি মঞ্চস্থ করার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই চলত তার প্রস্তুতি: সেখানে বেশি বাইরের জনসমাগমের নিয়ম ছিল না. কিন্তু মনোরমাদিরা কয়েকজন প্রতিমাদির সাহায্যে দূর থেকে দেখার একটু সুবিধা করে রোজই আসতেন। গুরুদেব ও দিনুবাবু দুজনেই শেখাতেন প্রাণ ঢেলে। গুরুদেবের শিক্ষা এতই হৃদয়গ্রাহী হত যে মনোরমাদি বলেন, "এখনকার নাটকাদিতে আমরা আর তেমন প্রাণের স্পর্শ পাই না, সবই যেন মনে হয় প্রাণহীন! গুরুদেব এত সুন্দর ভাবে নিজে করে দেখাতেন যে তাঁর নটকুশলতায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম। কথার কি ভঙ্গি! পুরুষের অংশ পুরুষের গলায়, মেয়ের অংশ মেয়ের গলায়, এ যে না শুনেছে তাকে বোঝানো যায় না।"

সুরুলে গ্রামসেবার কাজ আরম্ভ করেই কালীমোহনবাবুকে সুযোগ্য মনে করে সেখানে পাঠালেন দলপতির ভূমিকায়। গ্রামে গ্রামে ঘোরা ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করায় তিনি বহুকাল পূর্ব থেকেই অভ্যস্ত ছিলেন, কাজেই এই নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রত খুশি মনে মাথায় তুলে নিলেন গুরুদেবের আশীর্বাদের সাথে। বহুদিন এ কাজ করে এখানেই হঠাৎ সন্ন্যাস-রোগে দেহত্যাগ করেন তিনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

শ্রীনিকেতনে ছয় বৎসর কাটিয়ে, সন্তানসন্ততিসহ মনোরমাদি শান্তি-নিকেতনেই থাকতেন পুত্রকন্যার শিক্ষার সুবিধার জন্য— গুরুদেব তাঁদের এত খোঁজ রাখতেন যে, অপরাহ্নে তাঁর নিকট গেলে, পুঙ্খানুপুঙ্খ সব জানতে চাইতেন এবং সেদিন দ্বিপ্রহরে মনোরমাদি কি রান্না করলেন তা পর্যন্ত অনায়াসে বলে দিয়ে চমৎকৃত করে দিতেন।

মনোরমাদি বলেন, তাঁর পুত্রদের নামকরণ করেছিলেন নামের শেষে 'ময়' সংযোগ করে, যেমন শান্তিময়, সাগরময়, সমীরময় প্রভৃতি। জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তিময় ক্রমশ সংগীত ও নৃত্যে সমান পারদর্শিতা লাভ করতে থাকেন। একবার উত্তরায়ণের বারান্দায় আয়োজিত একটি উৎসবে তিনি নাচ দেখিয়ে গুরুদেবকে এত সন্তুষ্ট করেন যে তিনি তাঁর নূতন নামকরণ করেন 'শান্তিদেব'। তদবধি তিনি এই নামেই খ্যাত।

মনোরমাদি গুরুদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন, "তাঁকে আমরা মানুষ না ভেবে দেবতারই মতো ভক্তি করতাম। তাঁরই দয়ায় এখানে ঠাঁই পেয়ে ধন্য হয়েছি, না হলে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড়ো— আমাদের ধারণার বাইরে ; কিন্তু সাধারণ ছোটো-খাটো মানবতার দিকেও তিনি মহান্।"

কবিগুরুর আদরিণী পুত্রবধূ— সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ও ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যের প্রায় সর্বশেষ ধারক, শান্তিনিকেতনের প্রতিমা-বৌঠান। সার্থকনামা তিনি, একাধারে রূপের প্রতিমা, গুণের প্রতিমা, সংস্কৃতির প্রতিমা! বাস করেন বর্তমানে উত্তরায়ণের এক কোণে অবস্থিত 'কোণার্কে'।

মনে প্রশ্ন জাগল— এই বাড়িটির নাম গুরুদেব 'কোণার্ক' রেখেছিলেন কেন? এক কোণে বলে, না পুরীর নিকটে সূর্য-মন্দির-সমন্বিত যে কোণার্ক-তীর্থ আছে তাকে মনে করে? প্রতিমাদি বললেন, "বোধ হয় এক কোণে অবস্থিত বলেই এর 'কোণার্ক' নামকরণ হয়েছিল।"

বাড়িটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সম্মুখাংশ অনেকটা মন্দিরের সম্মুখভাগে যেরূপ একটি খোলা প্রকাণ্ড নাটমন্দির থাকে সেইরূপ নাটমন্দির বিশিষ্ট, অথচ অত্যন্ত সুসমঞ্জস। অবশ্য পাঁচটি বাড়ির সমষ্টি উত্তরায়ণের প্রধান ও বৃহৎ বাড়ি উদয়ন, খুবই সুন্দর, কবিত্ব ও সুষমাব্যঞ্জক— তবুও তদপেক্ষা অনেক ছোটো কোণার্কও সৌন্দর্যে কম নয়। এই বাড়িগুলি কার পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত জানতে চাওয়ায় প্রতিমাদি বলেন যে, এখানকার বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের পরিকল্পনায় ও তৎসঙ্গে তাঁর স্বামী— রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনেক চিন্তার ফল সংযুক্ত হয়ে এই সুন্দর পুরী গড়ে উঠেছে। চতুর্দিকের নানাপ্রকার নূতন বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সুন্দর বাগানের সমষ্টি সবই রথীদার পরিকল্পনায় গঠিত। উত্তরায়ণের বাড়ি, বাগান এখন স্বদেশী বিদেশী প্রত্যেকের চক্ষেই এক সম্ভ্রমপূর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দের উদ্রেক করে।

কোণার্কের প্রধান কক্ষটিতে ঢুকেই দেয়াল-জোড়া অজন্তার ন্যায় এক বিরাট বুদ্ধের প্রাচীর-চিত্র চোখে পড়ে। প্রতিমাদির কাছ থেকে জানতে পারলাম, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নির্দেশক্রমে তাঁর ছাত্রগণ কর্তৃক এটি অঙ্কিত। গুরুদেব যখন এই বাড়িতে প্রথম বাস করেন তখন উপরের আচ্ছাদন খড়ের ছিল, পরে তা পাকা করা হয়। একপাশে উন্মুক্ত আকাশতলে, নানাবর্ণের উপবেশন-বেদী-সম্বলিত প্রকাণ্ড চত্বরটিও সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে সবেতেই একটি নূতনত্বের ছোঁয়া দর্শককে আনন্দ দেয়।

প্রতিমা ঠাকুর

এবার আলাপিনী-মহিলা-সমিতির আদি কথা জানতে চাওয়ায় শুনি— প্রতিমাদি যখন নববধূরূপে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করেন তার কিছুকাল পরে তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে এই সমিতির প্রথম আরম্ভ। নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। তিনি এ কাজে প্রতিমাদিকে খুবই উৎসাহ দিতেন, কারণ তিনি চাইতেন যে, এখানকার প্রত্যেকেই আশ্রম ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উন্নতিবিধানে কিছু করুক। প্রতিমাদিই এখানে প্রথম মেয়েদের আনন্দ-মেলার প্রবর্তন করেন।

সমিতির প্রধান পরিচালিকা প্রতিমাদি বয়োজ্যেষ্ঠা বড়োমা— দ্বিপেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরকে— প্রথম সভানেত্রীরূপে মনোনয়ন করেন— সে আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের কথা। তখন আশেপাশের গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রকার শিক্ষাবিস্তারের কাজই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। বহুকাল পরে বিশ্বভারতী এ কাজ নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ায় ও ইন্দিরাদি শেষজীবনে শান্তিনিকেতনকে স্থায়ী আবাসরূপে গ্রহণ করায় এবং বড়োমার স্থানান্তর গমনে— প্রতিমাদিই ইন্দিরাদিকে এর সভানেত্রী করেন। সেই থেকে ইন্দিরাদি আনন্দের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র সমিতিটির লালনপালনের ভার নেন ও স্বীয় আবাসে এর প্রত্যেক অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত। বর্তমানেও শ্রদ্ধেয়া প্রতিমাদি 'আলাপিনী'র যুগ্ম-সভানেত্রীর একজন। দৈহিক অসুস্থতার দরুণ এখন আর তেমন সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে না পারলেও তিনি এর পরম শুভার্থিনী।

প্রতিমা দেবীর নিকট শুনি—তাঁর তিন-চার বৎসর বয়সের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী তাঁর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে বলতেন, "এই সুন্দর মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করব। আশা করি ছোট্‌দিদি— গুণেন্দ্রনাথের স্ত্রী-তাঁর নাতনীটিকে আমায় দেবেন। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থেকে গেল তাঁর অকাল বিয়োগে।

রবীন্দ্রনাথ স্বর্গতা স্ত্রীর ইচ্ছা স্মরণ করে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রতিমা দেবীর বিবাহ দেন। প্রতিমা দেবীর বয়স তখন ষোলো বৎসর। ঐ বয়সেই তাঁর রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে কবিসম্রাট পুত্রবধূ-রূপে তাঁকে অতি সমাদরে তাঁর গৃহিণীহীন গৃহে গৃহলক্ষ্মীর উচ্চাসনে স্থান দিয়ে সেই যে ঘরে এনেছিলেন— সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি

তাঁকেই অবলম্বন করে ছিলেন।

উত্তরোত্তর প্রতিমা দেবীও নিজগুণে পৃথিবী-খ্যাত মহামানব শ্বশুরের মনে এমনই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন যে, শেষকালে পুত্রবধূ প্রতিমা ভিন্ন তাঁর এক পদ অগ্রসর হওয়ারও ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছা ছিল না।

শেষ জীবনে তাঁর পুত্রবধূকে আদরের ডাক 'বৌমা' থেকে 'মা-মণি'তে এসে পৌঁচেছিল, এবং যাঁরাই গুরুদেবের মুখে সে ডাক শুনেছেন তাঁরাই বলেছেন— এ ডাকে যেমন মধু ঝরে পড়ত তেমনি ফুটে উঠত এক পরম নির্ভরতার অকথিত বাণী। পুত্রবধূ ও শ্বশুরের সম্বন্ধটি যেন একটি অচ্ছেদ্য মধুরতার বন্ধনে গড়ে উঠেছিল অতি সহজে।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিশ্বকবি ঘুরে বেড়িয়েছেন কতবার— প্রায় প্রতিবারই প্রতিমা দেবী ছিলেন সঙ্গে।

কবি তাঁর আদরিণী পুত্রবধূকে কতটা ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তার একটুখানি আভাস পাই বহুকাল পূর্বে পড়া একটি লেখায়। কথাটি এত সুন্দর ও চিত্তগ্রাহী যে আজও তা মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কোনো নগরে নিমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথি রূপে ট্রেনে চলেছেন— পাশের কামরায় প্রতিমা দেবী প্রমুখেরা।

জনাকীর্ণ স্টেশনে ট্রেনটি আসা মাত্র উৎসুক জনতা রবীন্দ্রনাথকে সযত্নে নামিয়ে ফুলের মালায় আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। এ হেন সময়ে সকলকে সচকিত করে তিনি বললেন যে, "আরে আরে, তোমরা করছ কি? আমাকে তোমরা ফুলের মালায় ঢেকে ফেলছ, আর পাশের কামরায় যে আমার 'ব্রাইড-মাদার' রয়েছেন! যাও যাও— আগে তাঁকে নামাও!"

'ব্রাইড-মাদারের' অর্থটি এতদিন পর প্রতিমা দেবীর মুখে শোনা গেল। গুরুদেব বিদেশের গুণীসমাজে প্রতিমা দেবীকে পরিচিত করিয়ে বলতেন— "আমার বৌমা।" তার পর ব্যাখ্যা করে 'ডটার-ইন-ল' অর্থবোধক বাংলা 'বৌমা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ বলতেন— 'ব্রাইড-মাদার'!

প্রতিমা দেবীর মুখে শুনি গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর এক বারের কাশী-ভ্রমণের মনোজ্ঞ কাহিনী ও কাশীর অন্যতমা বিখ্যাত বাইজি সংগীত-কুশলী হোসনা-বিবির কথা।

নিখিল-ভারত-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনীর অধিবেশন বেনারসে— হোতা—

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃহৎ ব্যাপার—ভারতের বহু স্থান থেকে বহু সুধী সমাগত। মহা ধুমধামে এই যজ্ঞের আয়োজন কাশীর মতো শিক্ষা ধর্ম ও সংস্কৃতির ত্রিবেণী-সংগমে।

কিশোরী গোস্বামী মহাশয়ের বাড়িতে সভাপতি গুরুদেবের থাকার ব্যবস্থা। সঙ্গে আছেন প্রতিমা দেবী, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় ও প্রতিমা দেবীর বন্ধু বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী শ্রীমতী আঁদ্রে কারপ্লে এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আদর-আপ্যায়ন খাওয়ানো-দাওয়ানোতে আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা—সকলেই আনন্দে আছেন এমন সময় শহরের দু-চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি খবর দিলেন, কাশীর বিখ্যাত বাইজি হোস্‌নাবিবি দোলপূর্ণিমার প্রথম প্রভাতে গুরুদেবকে শোনাতে চান তাঁর কয়েকটি ভজন। পরদিনই দোলপূর্ণিমা, গুরুদেব সানন্দে সম্মতি দিলেন।

সাহিত্য-সম্মেলনীর উদ্বোধনের পূর্বদিন, দোলপূর্ণিমার প্রভাতে এলেন বাইজি। ভক্তি গদগদ-চিত্তে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে গুরুদেবের পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করলেন।

তাঁর কথাবার্তা অতি মার্জিত, আদব-কায়দা সৌজন্য অতুলনীয়। মধ্য-বয়সী, শ্যামাঙ্গিনী, বয়সের ভারে কিঞ্চিৎ স্থূল-দেহা বাইজি বিনীতভাবে বললেন— "এখন আর নাচি না, বসে বসেই 'ভাওবাৎলে' গাই। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আপনাকে একবার গান শোনাবার। ভগবৎ-কৃপায় আজ তা পূর্ণ হল।"

হোলির একখানা গান দিয়ে তিনি তাঁর গানের মালা গাঁথা শুরু করলেন। কি মধুর কণ্ঠস্বর! অভূতপূর্ব সংগীত! অত যে বয়স বাইজির কণ্ঠস্বরে তার আভাস ও নেই। অতি কোমল, অতি মধুর, যেন কিশোরীর কণ্ঠ। রাধাকৃষ্ণের দোললীলা বাইজির কণ্ঠে রূপ ধারণ করে যেন সকলের সম্মুখে মূর্ত হয়ে উঠল!

শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে শুনছেন— হোস্‌নাবিবি যেন ধ্যানমগ্নার মতো গেয়ে চলেছেন গানের পর গান তাঁর মার্গ-সংগীতের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে। দিলীপকুমার রায়, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের মতো সমঝদারগণ নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে শুনছেন বিমুগ্ধ চিত্তে।

ঘণ্টা। দুই পরে গান যখন থামল, সকলে বাক্যহারা! বাগ্মী ক্ষিতিমোহন বাবু হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর সহজাত বাক্য। বিদেশিনী কারপ্লে অভিভূত।

প্রতিমা দেবী বলেন, "হোস্‌নাবিবির মুখে শাস্ত্রীয় সংগীত শুনে বুঝলাম এঁদের মতো সঙ্গীতজ্ঞা ও কণ্ঠস্বর-ধারিণীদেরই আছে শাস্ত্রীয় সংগীত গাওয়ার অধিকার। দুটি ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কেটে গেল বোঝা গেল না—যেন সকলকে আনন্দ-রসে ডুবিয়ে দিল।"

গুরুদেব সে সংগীত-সুধায় মুগ্ধ হয়ে অনেক প্রশংসা করে বলেন, "এ কণ্ঠস্বর, —এমন সংগীত দুর্লভ।" বাইজি বলেন, "আজ আমার সমস্ত শিক্ষা ও জীবন সার্থক!" শ্রদ্ধানত চিত্তে পুনঃ পুনঃ গুরুদেবকে জানান সেলাম।

প্রতিমা দেবী আরও বলেন যে, বেনারসের এই দিনটি এতই সার্থক যে বহু দিন আগের কথা হলেও আজও সব পরিষ্কার মনে আছে। বান্ধবী কারপ্লে পরে যখন-তখন বলতেন, "দোলের দিন বেনারসে কি গানই না শুনেছিলাম! বাইজির কণ্ঠস্বর, আদব-কায়দা, বিনয়—ভোলা যায় না।" বিদেশিনীর মনে সে রেখে গেল এক স্থায়ী ছাপ।

সে যাত্রার আরও একটি অনুরূপ শিল্পীর কথা আজও প্রতিমা দেবীর স্পষ্ট মনে আছে। পরদিন এক 'পোলিশ' বেহালা-বাদক—যিনি তখন ভারত-ভ্রমণ করছিলেন তাঁর দক্ষ বাজনা শুনিয়ে—খবর দিলেন তিনি গুরুদেবকে বাজনা শোনাতে চান।

আবার বসল সংগীতের আসর। আবার সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলেন বিদেশী বাদকের হাতের অপূর্ব বাজনা। সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর পারের বিদেশী বিজাতীয় বাজনা—কিন্তু সকলের মন স্পর্শ করে একই ভাবে—যেমন করেছিল পূর্বদিন হোস্‌নাবিবির গান।

শান্তিনিকেতনবাসী প্রাচীন একজনের নিকট শুনি—গুরুদেব-সৃষ্ট শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গেও প্রতিমা দেবী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

গুরুদেব নাটক লিখে দিতেন, প্রতিমা দেবী তাকে নিজের শিল্পীমনে সাজাতেন। কার কোন্ পার্ট মানাবে ভালো—কাকে কোন্ পোশাকে ফুটবে অধিকতর—সব ঠিক করতেন প্রতিমা দেবী। গুরুদেবের আদর্শ ও রুচি অনুযায়ী তাঁর নাটককে মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে প্রতিমা দেবীর ছিল অসাধারণ পটুতা। তিনি সেকালে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন প্রতিটি নট-কুশলীকে।

প্রতিমা দেবী বললেন, "ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম একটি আনাড়ি মেয়ে, কিছুই জানি না। আমার শিক্ষা-দীক্ষা যা-কিছু সব আমার স্বামী এবং শ্বশুরের কৃতিত্ব। তাঁরাই আমাকে শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন চালিয়েছেন। প্রতিনিয়তই তাঁদের আমি শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। যখন প্রথম এখানে এলাম বাবামশাই শিশু-বিভাগের কুড়ি-পঁচিশটি ছোটো ছোটো ছেলে ও আশ্রমের অন্যান্য সকলকে দেখিয়ে বললেন, 'বৌমা, এই-সব নিয়েই তোমার সংসার।' শৈশব থেকেই আমিও তাই বুঝেছি।"

'পূজারিনী' কবিতাটি লেখা হয়েছে। একবার গুরুদেবের জন্মদিনের কিছু পূর্বে প্রতিমা দেবী বলেন, "বাবামশায়, এই পূজারিনীকে আপনি নাটকের রূপ দিন। এতে শুধুই মেয়ের অংশ থাকবে। আপনার জন্মদিনে তা এখানকার মেয়েদের দিয়ে মঞ্চস্থ করাব।"

বৌমার অনুরোধ!

গুরুদেব 'তথাস্তু' বলে খাতাপত্র নিয়ে বসে গেলেন, সময় বেশি নেই হাতে, বৌমার ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে।

সে সময়ে কেউ দেখা করতে গেলে, কি অযথা সময় নষ্ট করলে বলতেন, "রোসো, বৌমার কাজটুকু আগে সেরে দিই, তার পর অন্য সব হবে।"

প্রথম দিন প্রতিমা দেবীর পরিচালনায় এ নাটক যখন 'নটীর পূজা' নামে মঞ্চস্থ হল— সে যে কি অপরূপ মাধুর্যের সৃষ্টি করল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শেষ দৃশ্যে যখন নটী শ্রীমতীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয় তখন স্টেজের আলো একেবারে ম্লান করে দেওয়া হল, এবং গুরুদেব এক অঞ্জলি ফুল নিয়ে ধীরে ধীরে এসে সেই আবছা অন্ধকারে ছড়িয়ে দিলেন ভূলুণ্ঠিতা নটীর মস্তকে। দর্শকরা যেন সত্যকার শোকে অভিভূত হয়ে অশ্রুজলে তর্পণ করল!

কাহিনীটি বলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা সুধীরা বসু।

অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হল শান্তিনিকেতনের শৈল-বৌঠানের সঙ্গে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদি ছাত্র ও তৎপরে শিক্ষক— রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আজীবন সংযুক্ত— সন্তোষকুমার মজুমদার মহাশয়ের সহধর্মিণী— শৈল-বৌঠান। তিনি বিখ্যাত 'ইক-মিক-কুকারের' আবিষ্কর্তা স্বর্গীয় ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের একমাত্র কন্যা।

আজকাল বেশির ভাগ সময় কলকাতায় থাকায় এতদিন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়ে ওঠে নি। তিনিই বোধ হয় শান্তিনিকেতনের কর্মী-পত্নীদের মধ্যে প্রথমাগতা প্রাচীনতমা মহিলা। বয়স ষাটের কোঠায়— অতি অমায়িক, সদালাপী, হাসিখুশি শৈলদি নবপরিচিতাকে সাদরে গ্রহণ করে সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন ; শুনলাম, তিনি প্রতিমা-বৌঠানেরও পূর্বে নববধূরূপে শান্তিনিকেতনে আসেন ; তখন এখানে মহিলা বলতে প্রায় কেহই ছিলেন না— গুরুদেব স্বয়ং বরণ করে তাঁকে পুত্রবধূরূপে ঘরে নিয়েছিলেন।

শুনি শৈলদির বিয়ে হয় তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়সে। বিবাহের পক্ষকাল পরে যখন এলেন শান্তিনিকেতনে, তখন এখানে শিক্ষকদের পরিবারসহ থাকার কোনো বাড়িঘর ছিল না। মজুমদারদা তাঁকে নিয়ে গিয়ে উঠলেন সোজা শান্তিনিকেতন-ভবনের দোতলায়, গুরুদেবের তৎকালীন আবাসে। গুরুদেব দু হাত প্রসারিত করে "সন্তোষের বউ! এসো এসো" বলে যেন বধূবরণ করে তাঁকে ঘরে নিয়ে বসালেন। সে বরণে যদিও কুলো-ডালা ছিল না, কিন্তু অন্তরের মাধুর্যে উচ্ছল, সে বরণ শৈলদির মনে আজও উজ্জ্বল।

বালিকাবধূর বড়োই মন খারাপ— কেবলই প্রিয় ছোটো ভাইটির কথা মনে পড়ে ও সদ্য-পিতৃগৃহ-বিচ্ছেদ-ব্যথায় চোখ ছলছল করে। গুরুদেব যে কে, তা না জেনেই আবোল-তাবোল নানা কথায় তাঁর নিকট হৃদয়ভার লাঘবের চেষ্টায় বধূটি ঘুরে ফিরে কেবলই ভাইয়ের কথা বলায়, গুরুদেবও যেন শিশু হয়ে— সেই ছোট্ট ভাইটি হয়ে— নানা গল্পে, রসাল কথায় তাকে আনন্দ দিতে লাগলেন।

একদিন শান্তিনিকেতন-ভবনে থেকে পরদিন প্রভাতে গুরুদেব বললেন,

"চলো, আজ তোমাকে একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাব।" পায়ে মল, নাকে নোলক, তিন পাড়ের শাড়ি পরণে, মাথায় ঘোমটা— ছোট্ট বউটি, চলল ঝুম ঝুম করে মল বাজিয়ে আলখাল্লা-পরিহিত দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ— জগদ্বিখ্যাত কবির পিছু পিছু বড়ো রাস্তা দিয়ে। দুঃখের কথা তখনও আজকের মতো আলোক-চিত্র-গ্রহণের প্রাচুর্য ছিল না; কেউ যদি এ চিত্র তুলে রাখত, তবে একখানা দেখবার মতো ছবি হত।

বেশ খানিকটা দূরে নিচু-বাংলায় গিয়ে গুরুদেব বললেন, "বড়ো বৌমা, দেখো তোমার জন্য কী এনেছি।"

কর্মরতা বড়োমা— শ্রদ্ধেয়া হেমলতা ঠাকুর— বেরিয়ে আসতেই বললেন, "আজ থেকে সন্তোষের বউকে তোমার জিম্মা করে দিলাম।"

স্নেহময়ী বড়োমা ছোটো বউটিকে সাদরে গ্রহণ করে কন্যার মতো যত্নে নিজের নিকট রাখেন প্রায় মাসখানেক।

দিন যায়, পরে দেহলি বাড়িটিতে শৈলদিরা কিছুদিন ছিলেন। ক্রমশ প্রথম পুত্র জন্মাবার পর মজুমদারদা গুরুদেবের নিকট হতে এক পত্র পেলেন। তিনি লিখেছেন— "শুনলাম তোমার একটি পুত্র হয়েছে, অতি আনন্দের কথা। এবার তুমি গৃহস্থ— গৃহস্থ হলেই তার একটি গৃহের প্রয়োজন; শুনেছি কিছু জমি পেয়েছ, সেই জমিতে এবার একটি গৃহ নির্মাণ করে সুখে কালাতিপাত করো।"

এর কিছু পূর্বেই মজুমদারদা শান্তিনিকেতন-সংলগ্ন, 'সুপুর-জমিদারি' থেকে একশো টাকার বিনিময়ে একশো বিঘা সুন্দর সমতল জমি পেয়েছিলেন। এখানেই তিনি বাঁধলেন একটি সুখনীড়।

আজকের পিয়ার্সন হাসপাতাল ও সেবা-পল্লি সবই ছিল মজুমদারদার সম্পত্তির মধ্যে।

সমস্ত পাঠ্য এবং কর্মজীবন এখানে কাটিয়ে অকালে— প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি সাধনোচিতধামে গমন করেন।

বাল্যে শিশু-ভ্রাতার বিরহে আকুল হয়ে সেই যে গুরুদেবের নিকট অন্তর খুলে দিয়েছিলেন, গুরুদেবও বিরক্ত হওয়া দূরে থাক্, শিশুমনের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন, সেই থেকে শৈলদির তাঁর নিকট যাতায়াত আলাপ-আলোচনা ছিল অবাধ সংকোচহীন।

ঘরকন্না সন্তানপালন প্রভৃতি ঘরোয়া মেয়েলি ব্যাপারে গুরুদেবের আদেশ-নির্দেশগুলি ছিল যেন মা-ঠাকুমার সমপর্যায়ের প্রবীণা গৃহিণীর! শৈলদির সন্তানাদি হবার অনেক পর বলতেন, "তোমরা এ কালের মেয়েরা ছেলে মানুষ করতে জান না। আমাদের সময়ে শিশুকে তেল মাখিয়ে রৌদ্রে ফেলে রাখত; তার ফল এই আমাকেই দেখো-না, এত ঝড়-ঝাপ্টা, রোগের আক্রমণ অগ্রাহ্য করে, এত বয়সেও কেমন দিব্যি বেঁচে আছি।"—বলেই সাদা ধবধবে হাত দুখানা একটু খুলে দেখাতেন।

এক সময় বলেছিলেন, "শৈল, তোমরা যে ক'টি মহিলা এখানে আছ, সকলে মিলে সপ্তাহে একদিন সমবায় রন্ধন-শালায় রাঁধবে।" শৈলদিরা বহুদিন এ নির্দেশ পালন করে চলেছিলেন।

গুরুদেব শিশু-বিভাগের শিশুদের পড়ানোর ভারও এক সময়ে শৈলদির উপরে ন্যস্ত করেছিলেন এবং তিনিও তা আনন্দে গ্রহণ করেছিলেন। একবার তিনি শিশুদের ঘুড়ি উপহার দিয়েছিলেন—সে এক মজার কাণ্ড! কলকাতা থেকে এক টাকায় একশো আটাশ খানা ঘুড়ি কিনে সব ছেলেকে একটি করে ঘুড়ি দিলেন। সেদিন শান্তিনিকেতনের আকাশ রঙবেরঙের ঘুড়িতে রঙীন হয়ে উঠল। এতে যত খুশি ছেলেরা, ততোধিক খুশি গুরুদেব।

গুরুদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে বহু পাশ্চাত্য দেশবাসী জ্ঞানী গুণী মহাপ্রাণ শান্তিনিকেতনে বসবাস করে গেছেন। শৈলদি আচার-পরায়ণা প্রাচীনা হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে অতি সহজে মেলামেশা করে তাঁদের চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এখনও তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছেন—মিঃ পিয়ার্সন, এণ্ড্রুজ, উইন্টারনিস, বোগদানা, এলম্‌হার্স্ট, মিঃ ও মিসেস বাকে, মিঃ ও মিসেস স্টেনকোনো, মিসেস ভ্যানাগান, সিলভাঁ লেভি, মাদাম লেভি প্রভৃতি। সিলভাঁ লেভি পাণ্ডিত্যে যত বড়োই হোন-না কেন, স্বভাবে ছিলেন একেবারে সরল শিশু!

শুনলাম গুরুদেব বলতেন, "পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজের মতো মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটলে পাশ্চাত্য-সভ্যতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত।"

এঁরা সকলেই ছিলেন গুরুদেব ও ভারতের প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধাশীল—অতি মনঃসংযোগে এঁরা শিখতেন বাংলা, সংস্কৃত। গভীর শ্রদ্ধার চোখে

দেখতেন প্রাচ্য রীতিনীতি। এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁর জাতীয় পোশাক ত্যাগ করে ধরেছিলেন ভারতের ধুতি ও কুর্তা। সকলেই জানেন, আজীবন অভ্যস্ত না থাকলে ধুতি পরা কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ; কিন্তু আহারে-পরিধানে মনে-প্রাণে তাঁরা হতে চেষ্টা করতেন গুরুদেবের দেশের মানুষ। এ সবেরই মূল— গুরুদেবের প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

গুরুদেবের কথা বলতে বলতে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে শৈলদির গুরুদেব সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা মনে পড়ল। শুনলাম— মজুমদারদা স্বর্গীয় হবার পর শৈলদির নববিবাহিতা পুত্রবধূর হাতে গুরুদেব কিছু খেতে চেয়েছিলেন। এর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর হঠাৎ মংপু যাওয়া স্থির হয়। শৈলদি এ কথা শুনেই পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যে উপকরণ পেলেন তাই দিয়ে খাজা ও ক্ষীরের পেরাকি তৈরি করে নববধূর হাতে পাঠিয়ে দিলেন উত্তরায়ণে। নিজে একটু পরিশ্রান্ত থাকায় বললেন— পরে যাবেন। বৌমা খাবার নিয়ে গিয়ে দেখেন গুরুদেবের আহার সমাপ্ত।

বৌমাকে দেখে খুশি হয়ে খানিক ক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর খাবার রাখিয়ে বললেন যে বিকালে রওনা হবার পূর্বে চায়ের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন।

গ্রীষ্মকাল, অতিরিক্ত রৌদ্রের তেজ হওয়ায় শৈলদি সেদিন আর উত্তরায়ণে যেতে না পারায় ও গুরুদেব সেইদিনই অপরাহ্নে কলকাতা চলে যাচ্ছেন শোনায়, অত্যন্ত দুঃখিত মনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বসে এই সবই চিন্তা করছিলেন। গুরুদেবের তখন স্বাস্থ্য খারাপ, বয়স হয়েছে, কতদূরে যাচ্ছেন, আবার কবে দেখা হয় কে জানে— একবার তাঁকে প্রণাম করা হল না, এই-সব মনের ভিতরে কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। পরদিন ভোরে একজন খবর দিলেন যে, গুরুদেবের কাল কলকাতা যাওয়া হয় নি— স্টেশনে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।

চমকিত শৈলদি তৎক্ষণাৎ গুরুদেব-দর্শনে ছুটে গেলেন। গুরুদেব তখন ছিলেন উদীচীর দোতলায়, নীচে গুরুদেবের কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদির সঙ্গে দেখা।

মীরাদি বললেন, "শৈল, তোমাদের খাবার খেয়ে বাবামশায় কাল খুব খুশি হয়েছেন। আমাকে বলে গিয়েছিলেন, আমি যেন নিজে গিয়ে এ কথা তোমাকে জানাই। দাসদাসী দিয়ে যেন জানানো না হয়, সে বিষয়ে

বারবার সতর্ক করে স্টেশনে গেলেন, কিন্তু কি হল জানি না— একটু পরেই ফিরে এলেন। ওপরে আছেন— যাও, দেখা করো গিয়ে।"

শৈলদি উপরে গিয়ে প্রণাম করায় গুরুদেব স্মিতহাস্যে বললেন, "তোমার কল্যাণ হোক। বৌমাটি তোমার লক্ষ্মী, কাল যে তাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়েছিলে, তা কে করেছিল ?" শৈলদি নিজেই করেছেন বলায়— বললেন. "খাবার খুব ভালো হয়েছিল, আমি খুব খুশি হয়েছি। তা এবার থেকে তো সবই বৌমার হাতে যাবে— বৌমাটি ভালো, তোমার খুব সুখের ঘর-সংসার হবে।" শৈলদি বললেন, "সবই আপনার আশীর্বাদে।"

আরও একবার—

শেষ কলকাতা যাত্রার পূর্বে গুরুদেব অত্যন্ত অসুস্থ, কোনো বাইরের আগন্তুককে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না ; শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ছেলেমেয়ে সব সময় তাঁর শুশ্রূষার জন্য নিকটে থাকে ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী দেখাশোনা করেন, এমন সময়ে শিল্পী নন্দলাল বসুর এক দূর-সম্পর্কিতা আত্মীয়া তাঁদের বাড়ি এলেন গুরুদেবকে দর্শন করার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। নন্দলালবাবুর ছেলে যদিও শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন তবুও তাঁরা সকলেই বললেন, "এ যে অসাধ্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই পারে না।"

মহিলাটি অত্যন্ত দুঃখিত মনে ভাবেন, 'শান্তিনিকেতনে এসেও একবার গুরুদেবের দর্শন পাব না ? কথা নয়, লেখা নয়, শুধু একবার চোখের দেখা। তাতেও বঞ্চিত হব ? আমার ভাগ্যই খারাপ।' তাঁর দুঃখ শুনে অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিলেন শৈল-বৌঠানের নিকট যেতে। গুরুদেবের নিকট সব সময়ই তাঁর অবারিত দ্বার, যদি দর্শন সম্ভব হয়, তবে তাঁর মাধ্যমেই হতে পারে। মহিলাটি অনুরোধ জানালেন শৈল-বৌঠানকে। শুনে তিনি বললেন, "কথা নয়, অন্য কিছু নয়, শুধু একবার দেখা— আচ্ছা, দেখি যদি সুবিধা করতে পারি।"

শৈলদি পরদিন মহিলাটিকে নিয়ে উত্তরায়ণের বারান্দায় বসিয়ে নিজে গেলেন গুরুদেবের শোবার ঘরে ; একতলার একটি কামরায় তখন তাঁর শোবার ব্যবস্থা, পাশের বারান্দা বড়ো বড়ো ফুলের টব দিয়ে ঘিরে সেখানে একটু বসার ব্যবস্থা। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে ভিন্ন সেখানে যাবার কোনো

পথ নেই। গুরুদেব তখন সেই ছোটো ঘেরা জায়গাটুকুতে আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে ও প্রতিমা দেবী আশেপাশে উপবিষ্ট, শৈলদি শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন গুরুদেবের পিছনটিতে। কিছু ক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল, কারও মুখে কোনো কথা নেই, হঠাৎ কর্তৃপক্ষীয় একজন এসে খবর দিলেন, একটি জাপানী চিত্রকর এসেছেন তাঁর একখানা চিত্র গুরুদেবকে উপহার দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। গুরুদেবের সম্মতিক্রমে ফুলের টব সরিয়ে রাস্তা করে তাঁকে নিয়ে আসা হল সম্মুখ পথে। ক্ষণ পরে সে বিদায় নেওয়ার পর হঠাৎ গুরুদেব মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "শৈল! তুমি?" মুহূর্তে গুরুদেবের রোগক্লিষ্ট মুখের পরিবর্তে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আনন শৈলদির নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হল। শৈলদি অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে পূর্ব-বর্ণিত মহিলার অভিলাষ জানানোয় গুরুদেব উজ্জ্বল মুখে তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন ও সম্মুখের রাস্তা দিয়েই তাঁকে এনে গুরুদেবকে দর্শন করালেন। গুরুদেব সেই উদ্ভাসিত আননে নিঃশব্দে মহিলাটির মস্তকে হাত রেখে নীরব আশীর্বাদে তাঁকে ধন্য করলেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে গুরুদেবের দর্শন পাই মুহূর্তের জন্য। সেই মুহূর্তটি এতই স্মরণীয় যে লিখে রাখি খাতার পাতায় 'ক্ষণস্মৃতি' নামে। সেই জীর্ণ খাতার 'ক্ষণস্মৃতি' থেকে কিছু তুলে ধরি—

শান্তিনিকেতনের একটি দিনের স্মৃতি ও কবিগুরুকে মুহূর্তের জন্য দেখা, মনে চিরদিনের জন্য উজ্জ্বল হয়ে রইল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের' রজত-জয়ন্তী উৎসব হয় কলকাতায়। এই উপলক্ষে দেশ-বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিকের আগমন হয় এখানে। দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী আমরাও বহুদিন পর পুণা থেকে কলকাতা আসি এই উপলক্ষে।

বিজ্ঞানসভার কাজের পর ঐ সভার অভ্যর্থনা-সমিতি দু'-একদিন স্থানীয় ও তৎপার্শ্ববর্তী বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলো দেখাবার বন্দোবস্ত করেন বরাবর—এবারে বাইরের দ্রষ্টব্য স্থানের অন্যতম শান্তিনিকেতন হওয়ায় আমরা সাগ্রহে তাতেই নাম দিলাম।

চার দাদাই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র। শিশুকালে তাঁদের বলা এখানকার গল্পগুলো কত-না আগ্রহে শুনেছি। তাঁদের মুখে— 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন' গানখানা শুনে পর্যন্ত স্থানটি দেখার জন্য প্রাণ বড়ো ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঘটনাচক্রে বোম্বাই-প্রবাসী হয়ে পড়ায়, মধ্যজীবন পর্যন্ত গুরুদেব ও তাঁর শান্তিনিকেতন দর্শন ছিল স্বপ্নের অগোচর।

এই হঠাৎ-পাওয়া সুযোগে অতি আনন্দে স্পেশাল ট্রেন-যোগে রাত্রি-বেলা হাওড়া থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা পঞ্চাশ-ষাট জন বিভিন্ন দেশের অধিবাসী একত্রে এক সুন্দর প্রভাতে বোলপুর স্টেশনে এসে নামলাম।

ষ্টেশনটি বড়োই অপরিষ্কার। ধূলি-ধূসরিত রাস্তা ও মাছিপূর্ণ খাবারের দোকান মনে ভীতি জাগায়। শান্তিনিকেতনের বাস্ সহযোগে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শান্তিনিকেতন। এখানে এসেই মনে হয় যেন অন্য রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েছি ; ধুলো নেই, ময়লা নেই, পরিষ্কার

মাঠঘাট, দূরে দূরে অল্প কয়েকখানা বাড়ি।

মহিলাদের একটু বিশ্রামের জন্য নিয়ে যাওয়া হল শ্রী-ভবনে। শ্রী-ভবন তখন নূতনের মতোই ঝকঝকে ও শ্রীমণ্ডিত। দোতলা বাড়ি। নীচের হলঘরটির দেয়াল কলা-ভবনের ছাত্রদের আঁকা চমৎকার ফ্রেস্কো-ছবি-অলঙ্কৃত।

তখন এই ছাত্রী-আবাসের পরিচালিকা ছিলেন একজন মাদ্রাজী মহিলা। তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। উপরতলায় ছোটো ছোটো ঘরে মেয়েদের থাকার সুন্দর ব্যবস্থা; প্রত্যেক মেয়ের পড়ার টেবিলে গুরুদেবের ছোটো একটি ফোটো টাটকা ফুল অথবা মালা দিয়ে সাজানো। মেয়েদের মধ্যে প্রায় সবই অবাঙালি, বাঙালি মেয়েদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, দেখে বড়োই আশ্চর্যান্বিত হলাম। আরও একটি জিনিস, যাতে অত্যন্ত বিস্মিত হই তা—পাঞ্জাবী, গুজরাতী, আসামী, মাদ্রাজী, সিন্ধি, সিংহলী মেয়েদের মুখে অবিকৃত বাংলা ভাষায় কথোপকথন।

সমস্ত দিন সব দেখে শুনে আশাতিরিক্ত আনন্দ লাভ করে সন্ধ্যার গোধূলি-লগ্নে গুরুদেব-দর্শন। এখানে যা দেখি যা শুনি সবই নূতনত্বে ভরা। উন্মুক্ত-আকাশ-তলে গাছতলায় শিক্ষাদান, বাহ্য-আড়ম্বর-বিহীন কলাভবন, সংগীতভবন, সামান্য কাঁচা ঘরে প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার ও তাতে অমূল্য গ্রন্থরাজি—যা দেখি তাতেই চমক লাগে, মনে দোলা দেয় মহর্ষিদেবের সাধনপীঠ ছাতিমতলা ও মর্মরবেদী, 'তালধ্বজ' নামে তালগাছকে কেন্দ্র করে মাটির কাঁচা বাড়িটি—উত্তরায়ণের বাড়িগুলোর গম্ভীর সৌন্দর্য ও বাগানের লতানো আম-লিচু-সফেদা-পেয়ারার গাছগুলো পর্যন্ত।

ফুলে-ফুলময় বিচিত্র উত্তরায়ণের বাগানের ভিতরে একটি অদ্ভুত ধরণের সু-উচ্চ ঘর। নীচে কংক্রিটের সরু সরু দোতলার সমান উঁচু কয়েকটি থামের উপরে চতুর্দিকে কাঁচ দেওয়া এই ঘর ও ছোটো বারান্দাটি যেন বাংলার চাষীরা ফসল পাকলে তা পাহারা দেবার জন্য ক্ষেতের মধ্যে যে মাচান তৈরি করে তারই অনুরূপ। সেই ঘরটিতেই তখন গুরুদেব থাকতেন। পরে এই ঘরটিকে অনেক অদল-বদল করে নাম দেওয়া হয়—'গুহা ঘর'।

অনেক দিন রোগ-ভোগে গুরুদেব বড়োই দুর্বল, চলাফেরায় অক্ষম, বেশি কথা বলাও ডাক্তারের নিষেধ। ছোটো বারান্দাটিতে একখানি আরাম-

কেদারায় উপবিষ্ট, ছোটো সিঁড়ি দিয়ে আমাদের দুজন করে তাঁকে দর্শন করিয়ে তৎক্ষণাৎ নীচে নিয়ে আসার ব্যবস্থা।

দুরু দুরু বক্ষে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, গোধূলির রক্তিম আলোয় তিনি যেন আমার চক্ষে এক উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেবলোকবাসীরূপে প্রতিভাত হলেন। শুনেছিলাম, তিনি অপূর্ব দেহসৌন্দর্যের অধিকারী কিন্তু তা যে এতটা সুন্দর তা ভাবি নি— এ যেন কল্পনাতীত!

আশ মিটিয়ে দেখার উপায় নেই, পশ্চাতে অপেক্ষমান জনসমষ্টি সম্মুখে আসার জন্য ব্যগ্র, এত বড়ো দলটির ভিতরে মাত্র তিনটি বঙ্গবালার মধ্যে আমিই গুরুদেবের গলার স্বর একটুখানি শোনার আশায় বলি, "প্রবাসী বাঙালি আমরা, বহুদূর থেকে এসেছি, বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল।" তিনি মাথায় হাত রেখে নীরব আশীর্বাদের পর বললেন, "আমি রোগে অশক্ত, তোমাদের বোধ হয় কিছুই আদর-যত্ন হল না।"

স্থান-ত্যাগের তাগাদায়—কি যে অকৃত্রিম যত্ন পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, চতুর্দিকে তাঁর অনুপম সৃষ্টি দেখে কত আনন্দ পেয়েছি— তা আর বলার সময় হল না। গভীর শ্রদ্ধায় নত হয়ে তাঁর সম্মুখ হতে চলে এলাম।

সন্ধ্যার পর দিকে দিকে বিজলী-বাতি জ্বলে উঠল। স্থানটি অপরূপ শোভা ধারণ করল। তখন মনে যে প্রশ্ন বিরাট আকার ধারণ করেছিল আজ পঁচিশ বৎসর পরে তা সফল স্বপ্নে পরিণত।

মনে হয়েছিল, বাঙালি স্বাস্থ্যান্বেষণে মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে কত দূর-দূরান্তরে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করেছে; ঘরের পাশের এমন মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে স্বাস্থ্যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে মনের আনন্দে দলে দলে শিক্ষিত মানুষ এখানে বাস করে না কেন? নিজেরাই যে জীবনসায়াহ্নে আবার এখানে স্থায়ীভাবে বাস করব—শান্তিনিকেতন যে আমাদের বার্ধক্যের শান্তিনিলয় হবে, তা কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলাম? আরও মনে হয়েছিল, গুরুদেবের এত কষ্টের, এত সংগ্রামের, এত স্বার্থত্যাগের ভিতরে যে বিশ্বভারতীর জন্ম— তা যেন তাঁর নশ্বরদেহের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস না হয়, যেন দেশবাসীর সম্মিলিত চেষ্টায় তা উত্তরোত্তর আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তবেই হবে তাঁর প্রতি আমাদের সত্যকার শ্রদ্ধানিবেদন।

সন্ধ্যার পর একটি মাটির ঘরে বিদেশাগত অতিথির দলটিকে দেখানো হয় চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য। কবিগুরু ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় নীরবে বসেন দর্শকদের মধ্যস্থানে। তাঁর আদরিণী দৌহিত্রী নন্দিতা অপূর্ব নৃত্যকুশলতা দেখান চিত্রাঙ্গদারূপে। ঘরে অখণ্ড নীরবতা, শুধু মধ্যে মধ্যে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার 'সাধু সাধু' রব।— এটি বিদেশীদের পূর্বেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে, হাততালির চটপট শব্দে গুরুদেব অত্যন্ত বিরক্ত হন, তার বদলে তিনি প্রবর্তন করেছেন 'সাধু সাধু' রব। জীবনের অনেক প্রথম দেখার আনন্দে মন ভরিয়ে, এখানকার উদার আতিথেয়তায় দেহমনের খোরাক যুগিয়ে মধ্যরাত্রে প্রভাতের ছেড়ে-আসা ট্রেনটিতে আবার কলকাতা যাত্রা।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শৈশব—না আছে বাড়ি-ঘর, না মানুষ-জন। সামান্য কয়েকটি ছাত্র নিয়ে গাছতলায় বসে বিদ্যা দেওয়া-নেওয়া, পর্ণকুটিরে বাস ও সামান্য আহারে ক্ষুন্নিবৃত্তি। এত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও গুটিকতক মানুষ গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে প্রদীপে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন এই দারিদ্র্য-অনলে। পতঙ্গের ন্যায় না পুড়ে তাঁরা আরও ভাস্বর হয়ে উঠতেন স্পর্শমণির স্পর্শে। গুরুপল্লির দু-চারখানা কাঁচা মাটির বাড়িতে থাকেন সেইরূপ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মী। বেতন যৎসামান্য— উদরের খোরাকের ঘাটতি মানসিক খোরাকেই বোধ হয় পূর্ণ হয়ে যেত। উদার অবারিত মাঠের মধ্যে আর কোনো পল্লির তখন চিহ্নও ছিল না। তেমনি দিনে এখানে আসেন সত্যচরণবাবু।

দিন যায়, গুরুপল্লির একটি বাড়িতে হঠাৎ একদিন ওঠে কচি গলার মিষ্টি সুরের গান। কে গায় এমন সুন্দর বাঁশির মতো কণ্ঠে? আশেপাশের সকলে এসে দেখেন গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের পরিবার এল এতদিন পর—তাঁরই পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার ঐ সুললিত কণ্ঠ-কাকলি।

সত্যচরণবাবু এখানে আসেন তাঁর তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে। বাড়ি পান না— কাজেই পরিবার-পরিজন সবই দেশে। নিজে অতি কষ্টে ছোটো একখানা ঘরে থাকেন ও আহার করেন সমবায়-রন্ধনশালায় প্রায় আট-দশ বৎসর ধরে। এমন সময় ভাগ্যক্রমে গুরুপল্লিতে একখানা বাড়ি পেয়ে সকলকে আনিয়ে নিলেন।

সহধর্মিণী অনিলা দেবী তিনটি শিশুকন্যাসহ এলেন শান্তিনিকেতনে। পল্লিগ্রামবাসিনী প্রথমটা এখানে এসে বিষম সংকুচিতা হয়ে উঠলেও পরে গুরুপল্লির গুরুপত্নীদের সদয় ব্যবহারে অল্প দিনেই সকলের সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে গেলেন।

ছোট্ট ফুটফুটে বছর পাঁচেকের বড়ো মেয়েটি স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় নাচে গায়, আশেপাশের সকলকে মুগ্ধ করে। ক্রমে কথাটা গুরুদেবের কানেও

গিয়ে পৌঁছায়। গুরুদেব তাকে ডেকে পাঠান। তার গান শুনে খুশি হয়ে বলেন, "খুকু, তোমার নাম কি?" খুকি বলে, "অণিমা—ডাক নাম মোহর।" গুরুদেব বলেন, "না, তোমার নাম অণিমা নয়—'কণিকা'। আমি তোমার নাম দিলাম 'কণিকা'। তুমি রোজ আসবে, আমি তোমায় গান শেখাব।" হাত ভরে দিলেন লজেন্স-বিস্কুট। তার মাকে বললেন, "মেয়ে এত রোগা কেন? ওর শরীর ভালো করতে হবে—আমি দেব ওষুধ।"

অনিলা দেবী প্রায়ই মেয়েকে নিয়ে যান গুরুদেবের নিকট। দু-এক দিন না গেলে তিনি গাড়ি পাঠিয়ে দেন—তাঁর ভালোবাসার পরিচয়ে অনিলা দেবী মুগ্ধ।

গুরুদেব যেমন গান শেখান—তেমনি শিশি শিশি ওষুধ খাওয়ান। মোহর মোটা আর হয় না। গুরুদেব বলেন, "নাচ ছাড়ো—শুধু গান গাও; দুটো একসঙ্গে হবে না।" অনিলা দেবীকে উপদেশ-নির্দেশ দেন তাঁর মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

একদিন অনিলা দেবী সকন্যা গিয়েছেন উত্তরায়ণে—গুরুদেব তাঁদের বসিয়ে বলেন, "মোহরের শরীর ভালো হচ্ছে না—কণিকা নাম দিয়েছি বলে কি সে চিরকালই ছোট্ট একটি 'কণা' হয়ে থাকবে? বৌমারা যাবেন কিছু দিনের জন্য পুরীতে—পাঠাবে তোমার মেয়েকে তাদের সঙ্গে? কিছু দিন সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে এলে হয়তো ওর শরীর ভালো হবে।" অনিলা দেবী কৃতজ্ঞচিত্তে বলেন, "বেশ তো!" তৎক্ষণাৎ প্রতিমা দেবীকে ডেকে গুরুদেব বলেন, "বৌমা, তোমাদের সঙ্গে মোহরকেও পুরী নিয়ে যাও। বেশ হবে—পুপের সঙ্গে খেলা করবে।"

মোহর গেল পুরীতে। মোহরের মাকে গুরুদেব যেন ছোটো মেয়েটির মতো নানা ভাবে আশ্বাস দিতে থাকেন। বলেন, "তোমার মন কেমন করছে না তো? দেখো তোমার মেয়ে তোমার জন্য কত ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। সে কি সুন্দর সমুদ্রের ঝিনুক! তুমিও তো ছেলেমানুষ, ঝিনুক তোমার খুব ভালো লাগবে। আর মোহরের শরীরও নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে।"

এর পর থেকে অনিলা দেবীর কন্যাটি থাকে বেশির ভাগ সময়েই গুরুদেবের নিকট উত্তরায়ণে, মাঝে মাঝে তিনি যান মেয়েকে দেখতে—তখন

গুরুদেবের কত আদর যত্ন! প্রতিমা দেবীকে বলেন, "বৌমা, মেয়েকেই কেবল খাওয়াবে? মেয়ের মাকেও কিছু খাওয়াও।"

আশ্রমের নাচ-গানের দলে মোহরের স্থান ছিল অপরিহার্য, কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে সে গুরুদেবের সঙ্গে। অনিলা দেবী নিশ্চিন্তমনে কন্যাকে সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। গুরুদেব তাকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি রাগাতেও ছাড়তেন না; বলতেন, "তুই ঝগড়াটি কিনা, তাই তোকে দিয়েছি 'দহলানীর' পার্ট! এর পর দেব মেছুনীর পার্ট। মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, হাঁটুর ওপরে কাপড় পরে মাছের চুপড়ি কাঁখে নিয়ে, পারবি তো সে পার্ট করতে?"

অসুখের সময় গুরুদেব রোজ সন্ধ্যায় মোহরকে ডেকে পাঠাতেন; তার মিষ্টি গলার গান শুনতে শুনতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।

গুরুদেবের মৃত্যুতে মোহরের শোকাবেগ প্রশমিত করা অনিলা দেবীর হয়েছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

অনিলা দেবী বলেন, "কত করুণা গুরুদেবের! তাঁরই দয়ায়, তাঁরই শিক্ষায় মেয়ে আমার রবীন্দ্রসংগীতের জগতে আপনার স্থান করে নিতে পেরেছে। আজ আমার যা-কিছু সবই তাঁর কৃপায়।"

দাক্ষিণাত্য-কন্যা সাবিত্রী কৃষ্ণান্ (গোবিন্দ) শান্তিনিকেতনের প্রাচীন বাসিন্দা। বর্তমানে বাস করেন 'মালঞ্চে'র ভিতরে এক পর্ণকুটিরে; বয়স প্রায় পঞ্চাশ।

তিন চার বৎসর পূর্বে তাঁকে প্রথম দেখে চমক লাগে। বর্ষীয়সী মহিলা, একাকিনী বাস করেন একটি কুটিরে, শেষ রাত্রে রোজ শোনা যায় তাঁর কণ্ঠসাধনের আওয়াজ। পরে দেখি, ঐ বয়সে তিনি ভর্তি হয়েছেন এখানকার কলাভবনের দুই বৎসরের কার্যক্রমযুক্ত হস্তশিল্প-শিক্ষণ শাখায়। ঐ বয়সে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে সূক্ষ্ম সূচিশিল্প শিক্ষায় নিবিষ্টচিত্ত দেখে আশ্চর্য হই। পরে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। তাঁর মাতৃভাষা তেলেগু হলেও, এখন চমৎকার বাংলা বলেন। ইংরেজি বাংলা হিন্দি কেনারিস তামিল ও তেলেগুতে কথোপকথনে তাঁর সমান দক্ষতা।

তাঁর নিকট গুরুদেবের বিষয় কিছু জানতে চাওয়ায় বলেন যে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর চোদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন। শিশুকাল থেকেই বিশেষ কোনো শিক্ষা না পেলেও, স্বভাবদত্ত কণ্ঠে খোলা গলায় গাইতেন ত্যাগরাজ, মীরা, মারাঠী সাধু সন্ত প্রভৃতির ভজন-কীর্তন। কর্ণাটিক সুরই তাঁর কণ্ঠে সমধিক সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে। কণ্ঠস্বর মধুর, উচ্চ, গীটকারী-বহুল হওয়ায় সকলেই তাঁর গানে আকৃষ্ট হতেন। তিনি ছিলেন মাদ্রাজের নিকট অ্যাডেয়ারে, অ্যানি বেসাণ্ট প্রতিষ্ঠিত থিয়জফিকেল সোসাইটির 'গিণ্ডি হাই স্কুলের' অবৈতনিক ছাত্রী।

গুরুদেব ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী বেসাণ্টের আমন্ত্রণে অ্যাডেয়ারে গিয়ে সাবিত্রী দেবীর মুখে প্রথম গান শোনেন দক্ষিণী সুরে মীনাক্ষী দেবীর একটি ভজন। শুনেই তিনি তাঁকে অনেক প্রশ্নের পর শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। প্রথমে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বালিকা সাবিত্রী নিজের দেশ, মা, বোন, স্বদেশের বন্ধুবান্ধব ছেড়ে বাংলাদেশে অপরিচিত পরিবেশে আসতে অসম্মত হলেও গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে অবশেষে স্বেচ্ছায় এখানে আসেন কিশোর বয়সে।

গুরুদেব স্বয়ং তাঁর সমস্ত ভার গ্রহণ ক'রে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। বাংলাভাষা, সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে অল্পদিনের মধ্যেই সাবিত্রীদেবী এখানে মনের আনন্দে বাস করতে থাকেন। গুরুদেব তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন, যখন তখন ডেকে পাঠাতেন ও গান গাইতে বলতেন।

দিনুবাবুকে ভার দিলেন সাবিত্রীকে যত্ন নিয়ে গান শেখাবার। সাবিত্রী দেবী বলেন—দিনুবাবুকে প্রথম দেখে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। দিনেন্দ্রনাথ লম্বা-চওড়া বিরাট পুরুষ—আর তাঁর চোখ দুটি এত বড়ো ও অসাধারণ যে, সেদিকে তাকাবামাত্র বালিকা-সাবিত্রীর বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ত। কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর সদয় ব্যবহারে ভয় দূর হয়ে গেল। গুরুদেব দিনেন্দ্রনাথকে বললেন, "সাবিত্রীকে প্রথমে পূরবীরাগের গান শেখা—ওর গলায় তা ফুটবে ভালো।" তাই তিনি প্রথমেই দিনুবাবুর নিকট শিখলেন—'অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে'...

আজও সাবিত্রী দেবীর কণ্ঠে ঐ গানখানি অপূর্ব হয়ে মূর্ত হয়। তার পর গুরুদেবের কঠিন রাগরাগিণী ঘেঁষা গানগুলি তিনি অনায়াসে শিখতে থাকেন। আশ্রমের উৎসবে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, কিংবা কলকাতার নিউ এম্পায়ারে একক গানের মধ্যে সাবিত্রীর তখন ছিল অগ্রাধিকার। বিবাহযোগ্য বয়স হবার পর তিনি তাঁর মাতৃভূমি বাঙ্গালোরে চলে আসেন। সে সময়কার লেখা দিনুবাবুর একটি চিঠিতে দেখি, তিনি লিখেছেন—"সাবিত্রী, তুমি আমাদের আশ্রম ত্যাগ করার পর আর তোমার মতো 'নীলাঞ্জন ছায়া' গাওয়ার উপযুক্ত গায়িকা পাই না।"

সাবিত্রী দেবী তাঁর গাওয়া দক্ষিণী সুরের প্রথম গানে গুরুদেবের বাক্য সংযোজনের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিলেন—

দুপুরের ছুটি, বেলা এগারোটা। এবার আহারাদি সমাধা করে একটু বিশ্রামান্তে আবার ক্লাশ। সাবিত্রী দেবী কলাভবন থেকে ছাত্রী-আবাসে এসে কেবল বই-খাতার বোঝা নামিয়েছেন, এমন সময় তত্ত্বাবধায়িকা হেমবালাদি বললেন, "সাবিত্রী, তোমার জন্য গুরুদেব লোক পাঠিয়েছেন, তুমি এখনি যাও তাঁর কাছে বনমালীর সঙ্গে।"

সাবিত্রী তখন ক্ষুধার্ত, বলেন—"খাওয়ার পরে যাব।" হেমবালাদি

বোঝান— "তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে, লক্ষ্মী মেয়ে, গুরুদেব ডাকছেন আগে দেখা করে এসো।"

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সাবিত্রী পরিচারক বনমালীর সঙ্গে উত্তরায়ণে এলেন। গুরুদেব একাকী একটা ঘরে বসে পা দোলাচ্ছেন, সাবিত্রীকে দেখেই বললেন, "বোসো সাবিত্রী, একটা গান করো।" এই দুপুরবেলা অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় গান! সাবিত্রী অবাক। গুরুদেব একটু ধমকের সুরে বললেন, "শিগ্‌গির আরম্ভ করো সেই গান, যেটা অ্যাডেয়ারে আমাকে প্রথম শুনিয়েছিলে।" থতমত খেয়ে সাবিত্রী আরম্ভ করেন মীনাক্ষীদেবীর ভজন। গুরুদেব বললেন, "আর একটু ধীর গতিতে।" খুব ধীর গতিতে আবার গাওয়ার পর তিনি বললেন, "একটু কাগজ দাও।" সাবিত্রীর নিকট কিছুই নেই; গুরুদেব ধমকে বললেন, "কিছু নেই? ঐ সামনের ময়লা কাগজের ঝুড়ি থেকে আনো শিগ্‌গির।" সেখানে ফেলে-দেওয়া কাগজ ঘেঁটে একটি বড়ো খাম পেয়ে সাবিত্রী তাই এনে দিলেন। গুরুদেব তার উল্টো পিঠে লিখলেন—

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বন-বনান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,
সরোবরতীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয় বাতাসে,
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।

বললেন, "তোমার মীনাক্ষীর 'মীনাক্ষী মে মুদম দেহি মে চ কাঙ্গী রাজ মাতঙ্গী'... প্রভৃতি কথাগুলির বদলে আমার কথাগুলি দিয়ে গাও।"

সাবিত্রীর তখন পেটে অগ্নিকাণ্ড— গলা দিয়ে গানের 'গ'ও আসছে না, সে কথা সে গুরুদেবকে বলেই ফেলল।

গুরুদেব বললেন, "সে হবে। তোমার জন্য রসম, দই-বড়া সব বৌমা করে রেখেছেন— কত খাবে, পরে খেও, এখন গানটা তো শেষ করো।"

বালিকা অনেক কষ্টে বাংলা কথায় দক্ষিণী সুর দিয়ে গাইল— বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী!

গুরুদেব তৎক্ষণাৎ ডাকালেন দিনুবাবুকে; দ্বিপ্রহরের নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়ায় বিরক্ত মুখে, বিশাল চেহারাখানা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি ভ্রূ

কুঞ্চিত করে। গুরুদেব সাবিত্রীকে দিয়ে আবার সে গানখানা গাওয়ালেন। দিনুবাবুর বিরক্ত-কুঞ্চিত মুখ ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে করুণ। গানের শেষে তিনি অশ্রুসজল চক্ষে বললেন, "রবিদা, কোথা থেকে তুমি এরকম কথাগুলি পাও?"

গুরুদেব একটু হেসে বললেন, "এবারে কলকাতার নিউ এম্পায়ারে বসন্তের 'নবীন' উৎসবের প্রথম গান হবে এটি, আর গাইবে সাবিত্রী।"

পরে এই গানটি স্থান পেয়েছে তাঁর 'নবীন' নামক বইটির প্রথম পাতায় ও তার পর গীতবিতানে।

সাবিত্রী দেবী সে সময় একটি মীরার ভজন ও একটি মরাঠী ভজনও খুব গাইতেন; সেই দুটি গানের সুর সামান্য অদল-বদল করে গুরুদেব রচনা করেন 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' এবং 'শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে' প্রভৃতি গান।

'বাজে করুণ সুরে' 'বেদনা কী ভাষায় রে' 'নীলাঞ্জন ছায়া' 'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী' 'কখন দিলে পরায়ে' প্রভৃতি সাত-আটটি গানে গুরুদেব সাবিত্রী দেবীর গাওয়া দক্ষিণী সুরে বাংলা শব্দ সংযোজন করে, নূতন রূপে প্রকাশ করেন।

সাবিত্রী দেবী ছাত্রী-অবস্থায় একবার অটোগ্রাফের খাতা গুরুদেবকে এগিয়ে দিয়ে আব্দার জানান কিছু লিখে দিতে। গুরুদেব লেখেন—

তব কণ্ঠে বাসা যদি পায় মোর গান
আমার সে দান, কিংবা তোমারই সে দান?

সাবিত্রী দেবী এর অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে বলেন, "গুরুদেব, কী লিখলেন? আমি যে বুঝতে পারছি না।" গুরুদেব কপট কোপের সুরে বললেন, "যা পালা এখান থেকে।" পাশে ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই —তিনি হেসে উঠলেন।

সাবিত্রী দেবী অল্পবয়সে ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত উচ্ছল, তাই দুরন্ত। কবিত্বপূর্ণ আম্রকুঞ্জে কচি আমের আশায় বীণাবাদিনী বাণীর রূপ ছেড়ে তিনি ধরতেন শাখা-মৃগের রূপ! গাছের মগ-ডালে উঠে কচি আম পেড়ে আনতে তাঁর জুড়ি সমস্ত মেয়ে-বোর্ডিং খুঁজে পাওয়া যেত না। আবার অসুস্থ হলে তাঁকে শয্যাবন্দিনী করে রাখা ও রোগীর পথ্য খাওয়ানো ছিল তত্ত্বাবধায়িকার

সাধ্যের অতীত। কাজেই তাঁর নামে নানা রিপোর্ট প্রায়ই গুরুদেবের কর্ণগোচর হত।

একদিন দুপুর বেলা অসময়ে উত্তরায়ণ থেকে গুরুদেবের ডাক এল। সাবিত্রী দেবী ভাবলেন, কি জানি কি আবার রিপোর্ট গেল গুরুদেবের কাছে। গুরুদেবের মধ্যাহ্ন-আহার সমাপ্ত, খাবার ঘরেই তিনি বসে আছেন— ভৃত্য বনমালী তখনও টেবিলের নিকট দণ্ডায়মান। গুরুদেব সাবিত্রীকে দেখেই বলে উঠলেন, "সাবিত্রী, তুমি কি শিখলে এখানে?" ঘাবড়ে গিয়ে সাবিত্রী মাথা চুলকাতে আরম্ভ করলেন।

গুরুদেব বললেন, "এত দিন রইলে এখানে— শিখলে কি? ঐ টেবিলের উপর প্লেটে যা আছে তা খাও।"

সাবিত্রী দেখেন চপ-জাতীয় একটি খাদ্য। আমিষ খাদ্যে তাঁর ঘৃণা। আরও ঘাবড়ে বললেন, "না গুরুদেব, ও আমি খেতে পারব না, ওর ভিতরে না জানি কি আছে।" গুরুদেব কপট গাম্ভীর্যে বলেন, "ওটা মাছের চপ, এতদিন বাংলাদেশে আছ, আর মাছ খেতে শিখলে না? তবে তুমি শিখলে কি?"

সাবিত্রী দেবীর তখন প্রায় কান্না এসে গেছে, বনমালী টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে; এবার গুরুদেব গাম্ভীর্য ত্যাগ করে হেসে বলেন, "ওরে বনমালী, যা বৌমার কাছ থেকে সন্দেশ রসগোল্লা মিষ্টি মিঠাই যা পাস সাবিত্রীর জন্যে নিয়ে আয়।"

তার পর কষ্টের পর হাসি— মিষ্টি মুখ— গুরুদেবকে গান শোনানো— তবে ছুটি।

এ ভাবে যখন-তখন তিনি সাবিত্রী দেবীকে ডেকে পাঠাতেন ও তাঁর গান শুনতেন। অল্পবয়সে গুরুদেবের অনেক কথাই বুঝতে না পারলেও সাবিত্রী দেবী এখন সবই বোঝেন মনে প্রাণে। গুরুদেব যে তাঁকে কত গভীর স্নেহ করতেন তা মনে করে এখনও মুহুর্মুহু চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। এখানকার মায়া কাটাতে না পেরে তাই আজও জীবনের অপর প্রান্তে এসে শান্তিনিকেতনের মাটি আঁকড়ে ধরে আছেন আপন মাটির মতো।

বহুদিন পূর্বে, গুরুদেব জীবিত থাকা কালে, সাবিত্রী দেবীর কচি কণ্ঠে গাওয়া দুখানা রবীন্দ্রসংগীত গ্রামোফোন রেকর্ডে ধরে রাখা হয়।

তার পর বিবাহিত জীবনে সুদূর বাঙ্গালোরে স্বামী-পুত্র-কন্যা-সম্বলিত সংসার নিয়ে জড়িত হয়ে পড়লেও সাবিত্রী দেবী ভুলতে পারেন না গুরুদেব-স্পৃষ্ট বাল্যের বহু আনন্দস্মৃতি-বিজড়িত শান্তিনিকেতনকে। সুযোগ পাওয়া মাত্র আবার তিনি চলে আসেন শান্তিনিকেতনে।

আজও তাঁর গান গাওয়ার শক্তি আছে অব্যাহত। স্বয়ং গুরুদেবের নিকট শোনা— দিনুবাবুর নিকট শিক্ষা— আজও সাবিত্রী দেবীর কণ্ঠে অনেক অপ্রচলিত কঠিন সুরের রবীন্দ্রসংগীত শুনে যেমন হই মুগ্ধ— ততোধিক বিস্মিত!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আবাল্য বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা জ্যোৎস্নালতা দেবী বর্তমানে শান্তিনিকেতনবাসিনী। তিনি বর্ষীয়সী, পূর্বপল্লিতে একমাত্র কন্যা ও অবসরপ্রাপ্ত জামাতার সহিত বাস করছেন পরম শান্তিতে। অমায়িক বিনয়ী সদালাপী ছেষট্টি বৎসর বয়স্কা জ্যোৎস্না দেবীর মধুর ব্যবহার মনোমুগ্ধকর।

তাঁর নিকট গুরুদেবের কথা কিছু শুনতে চাওয়ায় বললেন যে, তিনি তাঁর শিশুকালে গুরুদেবের কোলেপিঠে চড়ে মানুষ হয়েছেন। সন্তোষ মজুমদার মহাশয় তাঁর দাদা; গুরুদেবকে তাঁরা ডাকতেন কাকামশাই বলে, এবং শান্তিনিকেতনে এলে থাকতেন দেহলি কিংবা তার পাশের নূতন বাড়িতে। আবার গুরুদেবও অনেক সময় তাঁর বাবার কর্মস্থানে তাঁদের বাড়িতে এসে দীর্ঘ দিন থাকতেন নিজের বাড়ির মতোই।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে পিতামাতার মতো কাকামশাইকেও তাঁরা অতি আপনার বলে মনে করতেন। জ্যোৎস্না দেবী বলেন, "তাঁকে এত কাছে পেয়েছিলাম বলেই বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধে আলাদা করে বিশেষ কিছু বলা শক্ত। তিনি যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন।"

গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁর প্রথম স্মৃতি— কলকাতায় জ্যোৎস্না দেবীর পিতামহ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। গুরুদেব কলকাতায় এলেই তাঁকে দেখতে আসতেন। অসুস্থ ঠাকুর্দা তিনি এলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন ও গান শোনাতে অনুরোধ করতেন। চার-পাঁচ বৎসর বয়স্কা জ্যোৎস্না দেবীকে কোলে বসিয়ে তিনি গান গেয়ে যেতেন একটার পর একটা। তাঁর মিষ্টিগানে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শিশু জ্যোৎস্না নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকতেন তাঁর ক্রোড়ে।

তার পর আর একটু বড়ো-বয়সের একটি স্মৃতি— তাঁদের কৈলাস বসু স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁর বাবা শহরের বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। নিমন্ত্রিত অনেকের মধ্যে জ্যোৎস্না দেবীর স্মরণে আছেন— অক্ষয় বড়াল, ডি. এল. রায়, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত দীর্ঘকায়, উচ্চতায় সাধারণের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়ো। বোধ

হয় সে বাড়ির দরজাগুলি একটু নিচুই ছিল, সাধারণ মানুষের তাতে কোনো অসুবিধা না হলেও, সর্বদিক দিয়ে অসাধারণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই খেলেন মাথায় এক ঠোক্কর! ভিতরে গিয়ে জ্যোৎস্না দেবীর জননীকে বললেন "বৌঠান, বাড়ি ঢুকবার মুখেই তো বেশ একটি ঘা খাইয়ে দিলেন—এখন আবার না-জানি কি খাওয়াবেন!" বলে খুব হাসতে লাগলেন। জ্যোৎস্না দেবীর শিশুকালে তাঁর দৈহিক উচ্চতা দেখে খুব আশ্চর্য লাগত ও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে মনে হত যেন আকাশের দিকে চেয়ে কথা বলছেন।

তার পর তাঁর বাবা যখন গিরিডিতে হাকিম ছিলেন, তখন গুরুদেব ও তাঁর পরিবারের অনেকেই তাঁদের বাড়ি গিয়ে অনেক সময় থাকতেন।

মজুমদারমহাশয় গিরিডিতে স্যার নীলরতন সরকারের প্রকাণ্ড বাড়ি ভাড়া করে সেখানে থাকতেন এবং গুরুদেব এলে রোজ সন্ধ্যায় সে-বাড়ির বিশাল বারান্দায় বসে 'দারোগা-কাহিনী' নামে একটি বই পড়ে শোনাতেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের পাঠ শুনতে ক্রমশ সেখানে এত ভিড় জমে যেত যে, শেষকালে বারান্দায় আর স্থান সংকুলান হয়ে উঠত না। সবসময়েই তিনি জ্যোৎস্না দেবী ও তাঁর ভাই-বোনদের এত আদর করতেন যে, কাকা-মশাইয়ের দরদী মনের স্নেহ-ভালোবাসার কথা স্মরণ করে আজও তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

পিতার মৃত্যুর পর বাংলা ১৩১৫ সালে তাঁরা কলকাতায় এলে, গুরুদেব প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের বাড়ি এসে নীরব সান্ত্বনায় তাঁদের সকলকে অভিষিক্ত করতেন। ১৩১৭ সালে গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের ও জ্যোৎস্না দেবীর মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বিবাহ হয়। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ এবং জ্যোৎস্না দেবী ছিলেন এক বয়সী; তাঁদেরই মামার বাড়ি মুঙ্গেরে গিয়ে শমীন্দ্রনাথের ঘটে অকাল মৃত্যু।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের একটি মনোরম অথচ বেদনা-বিধুর চিত্র জ্যোৎস্না দেবীর নিকট পাই। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে খুব জাঁকজমক করে রথীবাবুর সঙ্গে প্রতিমা দেবীর বিবাহ হয়। জ্যোৎস্না দেবী সে বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভগ্নী সৌদামিনী দেবী বিবাহের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজে

মহা ব্যস্ত। চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও মাঝে মাঝে রথীবাবুর মার কথা মনে করে আঁচলে চোখ মুচছেন। অন্য ভগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবী রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, "যার সব— সে আজ কোথায়? যাঁর আশীর্বাদ মাথায় করে আদরের রথী যাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজে তিনিই রইলেন আজ অনুপস্থিত।"

চতুর্দিকে অগণিত নিমন্ত্রিতা। তাঁদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথের মা মৃণালিনী দেবীর আকৃতি সম্বন্ধে গুঞ্জন ওঠে। সে সভার সমগ্র মহিলাকুলের মধ্যে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী; তাঁকেই সকলে ধরলেন রথীবাবুর মা কেমন ছিলেন তার বর্ণনা দিতে। স্বর্ণকুমারী দেবীর কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর চেহারারই মতো অতি মধুর। তিনি ধীরে ধীরে বলতে থাকেন মৃণালিনী দেবীর কথা। বলেন, "তিনি ছিলেন আমাদের বাড়ির জ্যোতির্ময়ী বৌ! স্বভাব তাঁর এতই সুন্দর ছিল যে চেহারার কোনো ত্রুটি আমাদের চোখেই পড়ত না। গায়ের রঙ হয় তো একটু ময়লা ছিল, কিন্তু তা ঢেকে প্রকাশ পেত তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য। বাইরের সৌন্দর্য অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন অনেক বেশি ঐশ্বর্যশালিনী, মহিমময়ী!"

জ্যোৎস্না দেবীর বিবাহ হয় শ্রীরামপুর-নিবাসী সত্যেন্দুভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি আজীবন শ্রীরামপুরেই শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। বিবাহের পরও জ্যোৎস্না দেবী অনেক সময় শান্তিনিকেতনে আসতেন; তিনি ছিলেন রন্ধনে সুপটু। এক দিন হঠাৎ গুরুদেব তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি উত্তরায়ণে গিয়ে শোনেন গুরুদেবের নিকট এক ভদ্রমহিলা লিখে পাঠিয়েছেন যে এগারো রকম মোচার তরকারি রাঁধা যায়। গুরুদেব জ্যোৎস্না দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুই তো খুব রাঁধতে শিখেছিস শুনি—পারিস এগারো রকম মোচার তরকারি রাঁধতে?" জ্যোৎস্না দেবী বলেন, "কাকামশাই, এগারো রকম কেন, আমি পনেরো রকম মোচার তরকারি রাঁধতে পারি।"

গুরুদেব বললেন, "সত্যি? তবে খাওয়া আমাকে কাল থেকেই। দেখি তুই কেমন রান্নায় হাত পাকিয়েছিস!"

জ্যোৎস্না দেবী তখনই রাজি হয়ে বললেন, "আচ্ছা খাওয়াব, কিন্তু মোচা যোগাড় করি আগে। আমাদের গাছে মাত্র তিনটি মোচা হয়েছে দেখছি।"

তার পর প্রতিমা-বৌঠানের নিকট গিয়ে সব বলে বললেন, "মোচা দিতে

হবে।" প্রতিমা দেবী নিজেদের বাগান অনুসন্ধান করে আরও কিছু মোচা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। তখন জ্যোৎস্না দেবী প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার মোচার তরকারি রেঁধে পাঠাতে লাগলেন। তার ভিতরে বিবিধপ্রকার ঘণ্ট ডালনা চপ কাটলেট কোপ্তা পাতুরী আমিষ নিরামিষ রান্নার শিল্প-চাতুরীর কিছুই বাদ যায় নি। তেরো রকম খাওয়ার পর গুরুদেব খুশি হয়ে বলেন, "তোকে সার্টিফিকেট দেব।"

তার পরই তাঁর অন্যত্র যাওয়ায়, পনেরো রকম আর খাওয়ানো হয়ে ওঠে নি।

রান্নার কাহিনী ওঠায় জ্যোৎস্না দেবীর আর একটি পুরাতন ঘটনা মনে পড়ে। বাবা মারা যাওয়ার পর মার সঙ্গে তাঁরা আছেন দেহলি-সংলগ্ন নূতন বাড়িতে। মা হঠাৎ ছেলেমেয়েদের বলেন, "আমি কয়েক দিনের জন্য কাশী যাব, তোমরা মিলেমিশে সংসার চালাও।"

সন্তোষবাবু তখন সদ্যবিবাহিত, মা সকলকেই সুশৃঙ্খলায় কর্মবিভাগ করে অকস্মাৎ গেলেন কাশী।

গুরুদেব তখন থাকেন শান্তিনিকেতন-ভবনের দোতলায়। তাঁর খাবার আসে হেমলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়ে নিচু বাংলা থেকে। জ্যোৎস্না দেবীর জননী কাশী রওনা হয়ে যাবার পর সেই রাত্রেই গুরুদেবের পরিচারক এসে বলে, "দাদাবাবুর খাবার চাই।"

"কোথায়?"

"শান্তিনিকেতন-ভবনে।"

রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্তা জ্যোৎস্না দেবী ভাবলেন— কি জানি, দাদা হয় তো কোনো কারণে আটকে গেছেন শান্তিনিকেতন-ভবনে, আজ সেখানেই খাবেন। তাড়াতাড়ি যা রান্না করেছিলেন সব গুছিয়ে পরিচারকের হাতে দিলেন এবং মা যাবার আগে যে চমচম তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন তা থেকে চারখানা দিলেন।

একটু বাদেই বাড়ি আসেন সন্তোষবাবু। এসেই বলেন, "ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার দাও।"

বোনেরা অবাক! জ্যোৎস্না দেবীর দিদি বলেন, "একটু আগে যে তোমার খাবার কাকাবাবুর চাকর এসে নিয়ে গেল, তুমি খাও নি?"

সন্তোষবাবু বলেন, "সে কি! আমি তো সেখানে ছিলাম না, তা হলে হয়তো কোনো ভুল হয়েছে ; যাক—কাল জানা যাবে।"

পর দিন গুরুদেব সকালবেলা এসে উপস্থিত। এসেই বলেন, "কাল রাত্রে বেশ একটা মজা হয়েছে। নূতন চাকরটি নিচু বাংলাকে নূতন বাংলা শুনে তোমাদের এখান থেকে আমার রাত্রের খাবার নিয়ে গেছে। আমি চমচম খেয়েই বুঝতে পেরেছি, আমার বৌঠানের হাতে ছাড়া এমন চমচম হয় না ; তখন দাসচন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সত্য তথ্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

তার পর কৌতুকহাস্যে বলেন, "তা বৌঠান কোথায়?"

সন্তোষবাবুর স্ত্রী শৈল বলেন, "তিনি পালিয়েছেন।"

বিস্মিত গুরুদেব বলেন, "কোথায়?"

"কাশীতে।"

উপর্যুপরি বিস্ময় একটু প্রশমিত হলে গুরুদেব বলেন, "আচ্ছা, কাল রাত্রের খাবার কে তৈরি করেছিল?" সকলে জ্যোৎস্নার নাম বলায় তাঁর দিকে ফিরে বলেন, "খাসা রেঁধেছিলি তো! রুটিগুলো খুব নরম হয়েছিল, তা কাল থেকে রাত্রের খাবারটা তুই-ই আমাকে করে পাঠাস ; তবে কালকের খাবারের চেয়ে পরিমাণে অনেক কম দিস। চমচম খুব ভালো হয়েছিল— ঠিক যেন আমার বৌঠানের হাতের তৈরি। তা চমচমও কি তুই করেছিলি?"

জ্যোৎস্না—"না, মা যাবার আগে আমাদের জন্য করে রেখে গিয়েছিলেন।"

গুরুদেব স্মিতহাস্যে বলেন, "দেখলি? আমি কেমন বৌঠানের রান্না চিনতে পারি!"

একবার গুরুদেবের পা ফুলেছে। অনেক চিকিৎসায়ও ভালো হচ্ছে না —কয়েকদিন ভালো থাকেন, আবার পা ফুলে ওঠে। তিনি জ্যোৎস্না দেবীর মাকে বললেন, "বৌঠান, পা ফোলার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি, আপনি কিছু ওষুধ বলতে পারেন? জানেন কিছু টোটকা-টাটকা?"

শ্রীশবাবুর স্ত্রী বললেন, "জানি একটা দেশী ওষুধ— ভাটপাতার রস আর খড়ি গুলে গরম করে প্রলেপ দিলে সারতে পারে।" তখন সমস্যা— করে কে? গুরুদেব তখন উত্তরায়ণের আদি খড়ের বাড়িতে থাকেন একাকী ; একমাত্র সাধু চাকর সম্বল।

জ্যোৎস্না দেবী সাগ্রহে বললেন, "রোজ দুপুরে গিয়ে আমি কাকাবাবুর পায়ে প্রলেপ দিয়ে আসব।" গুরুদেব তাঁর পিঠ চাপড়ে চলে এলেন।

পরদিন ওষুধ তৈরি করে জ্যোৎস্না দেবী গিয়ে দেখেন সাধু দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় অচেতন— গুরুদেব লেখায় মগ্ন। প্রলেপটি গরম গরম মালিশ করে লাগানোই বিধি; গরম করার জন্য চাই একটি দেশলাই। ঘরের এ দিক ও দিক সন্ধান-রত জ্যোৎস্নাকে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন, "খুঁজছিস্ কি?"

জ্যোৎস্না বললেন, "দেশলাই।"

গুরুদেব বললেন, "দেশলাই! আমার ঘরে তুই খুঁজছিস্ দেশলাই! আমি কি সিগারেট খাই, না তামাক খাই, যে আমার ঘরে দেশলাই থাকবে?"

তখন মুশকিলে পড়ে জ্যোৎস্না দেবী রন্ধনশালা খুঁজে অনেক কষ্টে একটি দেশলাই যোগাড় করে কাগজ পুড়িয়ে ওষুধটি গরম করে গুরুদেবের পায়ে প্রলেপ দিলেন।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় পেলি দেশলাই?"

জ্যোৎস্না দেবী বলেন, "রান্নাঘরে তাকের ওপর।"

গুরুদেব বলেন, "সর্বনাশ! সাধুর সম্পত্তিতে হাত! ও যখন উনুন ধরাতে গিয়ে দীপ-শলাকা খুঁজে পাবে না তখন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। আর তুইও তো একটি আস্ত ডাকাত! জিনিস সাধুর— সাধুকে প্রত্যর্পণ করে যেও কিন্তু সাধু-মনে।"

তার পর থেকে জ্যোৎস্না দেবী বাড়ি থেকেই নিয়ে যেতেন দেশলাই। বেশ কিছুদিন এ ভাবে মালিশ ও প্রলেপের পর গুরুদেবের পা ফোলা সেবারের মতো একেবারেই সেরে যায়।

এক দিন মালিশের সময় দেখা করতে আসেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা রমা দেবী। তিনি জ্যোৎস্নাকে পায়ে মালিশ করতে দেখে বলেন, "রবিদা, আমরা আপনার একটু পা টিপে দিতে চাইলে কিছুতেই রাজি হন না, আর এখন জ্যোৎস্নাকে পা ছেড়ে দিয়ে তো বেশ চুপ করে বসে আছেন?"

গুরুদেব হাসিমুখে বললেন, "আরে ও যে ডাকাত! ওর হাত থেকে কি আমার রেহাই পাবার উপায় আছে?"

একদিন গুরুদেব জ্যোৎস্না দেবীকে তাঁর একটি কবিতা পড়ে শোনান ও মতামত জিজ্ঞাসা করেন; কবিতাটির নাম 'নিষ্ফল উপহার', তার প্রথমটা—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল

আগের লেখা প্রথম লাইনটি বদলে তিনি লেখেন— নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল।

জ্যোৎস্না দেবী শুনে বলেন, "না কাকাবাবু, আমার ভালো লাগছে না, আগেরটিই ছিল সুন্দর।"

গুরুদেব বললেন, "কেন ভালো লাগছে না ? পরেরটিও তো সুন্দর।"

জ্যোৎস্না দেবী বলেন, "না, আমার ওটা মোটেই সুন্দর লাগছে না।"

গুরুদেব হাতের খাতাখানা দিয়ে তাকে মৃদু এক ঘা মেরে হেসে বলেন, "অ্যাঁ ! পৃথিবীর মানুষ আমাকে মহাকবি বলে স্বীকার করেছে, আর তুই বলবি, আমার লেখা ভালো লাগছে না ! কেন লাগছে না তা বল।"

জ্যোৎস্না দেবী বলেন, "পূর্বের লেখায় যমুনার যে একটি সুন্দর চিত্র ভেসে ওঠে, পরেরটিতে তা হয় না ; শব্দবিন্যাসও আগেরটিরই সুন্দর মনে হয়।"

কবিতাটি দুই রূপেই প্রকাশিত হয়।

মেয়েরা পড়াশোনা করে গুরুদেব চিরকালই তা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। অনেক দিন পর জ্যোৎস্না দেবী শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বলতেন, "এই দেখ, তোর অনেক খোরাক জমিয়ে রেখেছি"— বলে দেখাতেন টেবিলের উপরের এক রাশ মাসিক, সাপ্তাহিক, গল্পের বই, যা তিনি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে সর্বদাই উপহার পেতেন। সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, "আজই নিয়ে যা আমার টেবিল থেকে।"

জ্যোৎস্নাদেবী বলেন, "আচ্ছা নেব।"

"কি করে নিবি ?"

"কিছু কিছু করে নিয়ে যাব।"

"না, তা হবে না, একবারে নিতে হবে।"

"তা হলে বারান্দায় নিয়ে রাখব, সেখান থেকে আস্তে আস্তে নেব।"

"উঁহু, তাও হবে না, তোর জন্যে অনেক দিন ওগুলো জমা আছে।" বলে হাসতে হাসতে ভৃত্যকে ডেকে বলেন, "ঝুড়ি এনে এই বইগুলো দিদিমণির বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়।"

স্বনামধন্য মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কলকাতার বিখ্যাত অ্যাটর্নি ও বিশিষ্ট নাগরিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের এক কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং তাঁর ভগ্নী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর বিবাহ দেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে।

এই হেমলতা দেবীই শান্তিনিকেতনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 'বড়ো মা'।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র, এবং শান্তিনিকেতনের আদি ছাত্রদের একজন—নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী— মমতাদেবীর নিকট গুরুদেবের কথা কিছু শুনি।

মমতা দেবী বিবাহের পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে একবার স্বামী-সহ শান্তি-নিকেতনে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন।

গুরুদেব তখন দেহলিতে বাস করেন। মমতা দেবীর বয়স অল্প—সংগীতে ছিল অনুরাগ— কাজেই সুযোগ পেয়ে ভর্তি হলেন দিনুবাবুর গানের ক্লাসে। বিকেলে যান গুরুদেবের সভায়।

এই নবাগতা কিশোরী বধূটি বিশ্বকবির উদার দৃষ্টিপথ থেকে বঞ্চিত হন নি। এক দিন তিনি মমতা দেবীকে বলেন, "আমি দেখেছি তুমি দিনুর গানের ক্লাসে যোগ দিয়েছ। খুব ভালো কথা—আমার কাছে এলে আমিও তোমাকে শেখাতে পারি।"

আবার পরক্ষণেই বলেন, "না থাক্, দিনুর কাছেই শেখো। আমি আবার কি শেখাতে কি শেখাবো, সব সময় সব সুর তো আমার মনে থাকে না— তোমার হয়তো পছন্দ হবে না। তার চেয়ে দিনুই শেখাবে ভালো।"

কিছু দিন মনের আনন্দে শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে তাঁরা ফিরে আসেন কলকাতায়।

বহু বৎসর পর সংসারের অনেক আঘাতে জর্জরিত হয়ে অকালবৈধব্যে জীবনের অনেক আনন্দে বঞ্চিতা হয়ে আবার মমতা দেবী যান শান্তিনিকেতনে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে।

গুরুদেব তখন ছিলেন শ্যামলীতে। মমতা দেবী প্রায়ই যান সেখানে;

গুরুদেব একদিন বলেন, "তুমি রাঁধতে জান?"

তিনি বলেন, "হ্যাঁ, একটু-আধটু জানি।"— যদিও তিনি ছিলেন পাকা রাঁধুনী।

গুরুদেব—"তা হলে কাল আমার জন্য কিছু রেঁধে পাঠিয়ে দিও তো।" মমতা দেবী পড়েন বেশ মুশকিলে। অল্পদিনের জন্য অস্থায়ী ভাবে ওখানে যাওয়া—থাকেন দেহলিতে—ইক্‌-মিক্‌-কুকারে নিজে একার জন্য কিছু ফুটিয়ে নেন। কী করে গুরুদেবকে তাঁর মুখরোচক কিছু রেঁধে দেবেন?

যা হোক দু-একজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায়, গুরুদেব কি খেতে ভালোবাসেন অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, 'চীজ' তাঁর অতি প্রিয় খাদ্য। তখন মমতা দেবী তাঁর জন্য চীজ-ভাত, মাছের আদা-ঝোল, কপির ঘণ্ট এবং আরও দু-একটি পদ রান্না করে নিয়ে যান শ্যামলীতে। গুরুদেব অত্যন্ত খুশি,—দেশী বিলাতির সংমিশ্রণে তৈরি 'চীজ-ভাত' খেয়ে বলেন, "উত্তম হয়েছে।"

গুরুদেব সর্বদাই খাওয়া নিয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা চালাতেন নিজের দেহের উপর। নিমপাতা সিদ্ধ করা সোনার রঙের জল কাঁচের গ্লাসে করে রোজ বিকেলে এক গ্লাস করে খাওয়া তো অনেকেই দেখেছেন, অনেকে আবার তাকে পেস্তা-বাদামের শরবত বলে ভুলও করেছেন।

কিন্তু মমতা দেবীর নিকট শুনে আশ্চর্য হই যে— এক সময় তিনি ক্যাস্টর-অয়েলের রান্না খেতেন।

বোধ হয় ক্যাস্টর-অয়েলের উপকারিতা ও তা গ্রহণের কৃচ্ছ্রতা থেকে জিহ্বাকে মুক্ত করার জন্যই এই পরীক্ষা। এই পরীক্ষার ফলাফল— এবং কত দিন তিনি নিজের উপরে এ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা কিন্তু জানা গেল না। তবুও, তাঁর রুটি-লুচিতে যে ক্যাস্টর-অয়েলের ময়ান দেওয়া হত — এ কথা বহুজনের নিকটেই শুনি।

পুরানো দিনের আরও একটি করুণ কাহিনী শুনি আর-একজনের নিকট।

বিশ্বকবির প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র— রূপে গুণে অতুলনীয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির শান্তিনিকেতনে গড়লেন একটি শান্তি-নিলয়— নাম দিলেন 'সুরপুরী'।

এখানকার খোওয়াইয়ের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তারই কিনারায় ভাঙনে

বাধা দিয়ে, বহু ব্যয়ে গড়ে তুললেন 'সুরপুরী'। এখানে সন্ধ্যার সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা ও অরুণোদয়ের লালিমায় মনে হয় ভগবান যেন তাঁর সৌন্দর্যের পশরা বিছিয়ে দিয়ে দৃষ্টির সম্মুখে এসে ধরা দেন। দূরে— উত্তরের উঁচু জমির তালগাছের সারি যেন মাথা নেড়ে দিন্-দুনিয়ার মালিককে অহর্নিশি জানায় অভিবাদন!

এই সুরপুরীতে একসময় বাস করতেন সুরশিল্পী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নী কমলা দেবী।

নিঃসন্তান কমলা দেবী— হৃদয়ের সমস্ত সুধা, সমস্ত স্নেহ ছড়িয়ে দিতেন আশ্রম-শিশুদের মধ্যে ও পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গে। তাঁর ছিল নানা দেশের নানা আকৃতির কুকুর-বেড়াল-ময়ূর-হরিণ।

তার মধ্যে হরিণটিই সমধিক প্রিয়। তার সেবায় তাঁর কেটে যায় দিনের অনেক সময়। মনের অনেকটা স্থান জুড়ে সে চপল চরণে লাফিয়ে বেড়ায়। যতই দিন যায় হরিণ শিশুটির গায়ের রঙ হয়ে ওঠে সোণার মতো দীপ্ত— সূর্যের আলোয় তাকে দেখায় যেন জানকীর মনোহরণকারী মায়ায়-গড়া স্বর্ণমৃগ।

আকৃতিতে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য সুরপুরীতে তৈরি হয় প্রশস্ত জালে ঘেরা স্থান। মনের আনন্দে চপল হরিণ দিনে দিনে শশিকলার মতো বাড়তে থাকে। তার যত্নের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না।

তার জন্য গড়ানো হল নানাবিধ অলংকার— গলার হার, চার পায়ের নূপুর! তার চলার ছন্দের নূপুর নিক্কণে কমলা দেবীর প্রাণে জাগে বাৎসল্য রস।

সব সময় কমলা দেবী তার সুখসুবিধা বিধানে ব্যস্ত— এমন সময় হঠাৎ একদিন দেখা গেল অকৃতজ্ঞ পশু পলাতক! এত আদর যত্ন উপেক্ষা করে বনের হরিণ উধাও!

দেখা গেল তারের ঘেরা পছন্দ না হওয়ায়, তার কেটে অতি কষ্টে বন্ধন-মুক্ত হয়ে সে হয়তো তার প্রিয় বনভূমির উদ্দেশেই পা ছুটিয়েছে।

কমলা দেবীর প্রাণে অসীম ব্যথা! অনেক খোঁজাখুঁজি চলল কয়েকদিন ধরে— কেউ বলে সে গিয়েছে সাঁওতালদের মাঝিপাড়ার দিকে, কেউ বলে গোয়ালপাড়ার দিকে, কেউ-বা বলে পারুলডাঙায়। সব পাড়া, সব ডাঙাই খোঁজা হল তন্ন তন্ন করে, কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না।

তখন সকলে বলতে লাগল— অমন নধর হরিণটি কি আর ক্ষুধার্ত মাংস-লোভী মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে বনে যেতে পেরেছে ? ওকে হয়তো কেটেকুটে রান্না করে গ্রামের মানুষ তাদের রসনা পরিতৃপ্ত করেছে।

শুনে কমলা দেবীর দুঃখ বেড়ে যায় আরও শত গুণ। বলেন, "এইজন্যই কি তাকে এত যত্নে বড়ো করেছিলাম ?" গুরুদেবের নিকট গিয়ে দুঃখের কথা জানান। তিনিও নিরুপায় হয়ে রইলেন বসে। কিন্তু কিছু ক্ষণের মধ্যেই কমলা দেবীর হাতে দিলেন একটি কবিতা।

এটি একটি বিখ্যাত গান—স্থান পেয়েছে গীতবিতানে। আজকাল বহু জনের মুখেই এই গানটি শোনা যায়, কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না গানটির উৎপত্তির মর্মন্তুদ কাহিনী। গানটি—

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে।
কে তারে বাঁধল অকারণে॥
গতিরাগের সে ছিল গান, আলোছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চমকে দিত বনে॥
মেঘলা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেত পায়ে
তমালছায়ে-ছায়ে।
ফাল্গুনে সে পিয়ালতলায় কে জানিত কোথায় পলায়
দখিন হাওয়ার চঞ্চলতার সনে॥

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর দেবোপম সান্নিধ্য লাভ করি তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনের পূর্বে— মাত্র কয়েক বৎসর। তিনি ছিলেন রূপে গুণে অতুলনীয়া— রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় আদরিণী ভ্রাতুষ্পুত্রী।

যখন প্রথম দর্শন লাভ করি, তখন ইন্দিরা দেবীর বয়স ছিল আশির উর্ধ্বে। কিন্তু শরীর ও মন এত সতেজ ও প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ ছিল যে এত শীঘ্র তিনি হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, সে কথা কখনও মনের কোণেও স্থান পায় নি। বোধ হয় সেইজন্যই যদিও গুরুদেবের সঙ্গে শিশুকাল থেকে তিনিই সকলের চেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট ও তাঁর সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক জানার অধিকারিণী এটুকু জানা ছিল—তবুও তাঁর নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ-কিছু জানার চেষ্টা করি নি। আজ সেজন্য মনে দুঃখ জাগে তবুও কথার ফাঁকে গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁর নিকট যেটুকু শুনেছি তাই বলার চেষ্টা করি।

শান্তিনিকেতনে সকলের মুখেই তাঁর 'বিবিদি' অথবা 'বিবি পিসি' নাম শুনে একদিন ইন্দিরা দেবীকে জিজ্ঞাসা করি "এ নামটি আপনার কোথা থেকে এল?"

তিনি হেসে জবাব দেন, "আমার শিশুকাল কেটেছে বাবার কর্মস্থল দাক্ষিণাত্যের কারোয়ারে। সেখানকার দাসদাসী আমার 'বিবি' নাম দেয়। তার পর সবাই তা গ্রহণ করে। কেবল রবিকাকা আমাকে মাঝে মাঝে ডাকতেন 'বব্' বলে। সে সময়ে রবিকাকা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে থাকতেন।"

ভাইঝি একটু বড়ো হওয়ার পর গুরুদেব তাঁকে এতই পছন্দ করতেন যে দূরে গেলেই তাঁকে বহু চিঠি লিখতেন। এমন-কি অনেক গভীর বিষয়ের কথাও বালিকা ভাইঝিকে লিখে যেন মনে আনন্দলাভ করতেন।

ইন্দিরা দেবীও তাঁর সেই বালিকা বয়স থেকেই মহামানব কাকার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই অল্প বয়সে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের অমূল্য চিঠিগুলি অতি যত্নে সংরক্ষণ ও পরে দুটি মোটা বাঁধানো খাতায় লিখে রাখেন, তাই আজ আমরা পুস্তকাকারে পাই অমূল্য গ্রন্থ 'ছিন্নপত্রাবলী'।
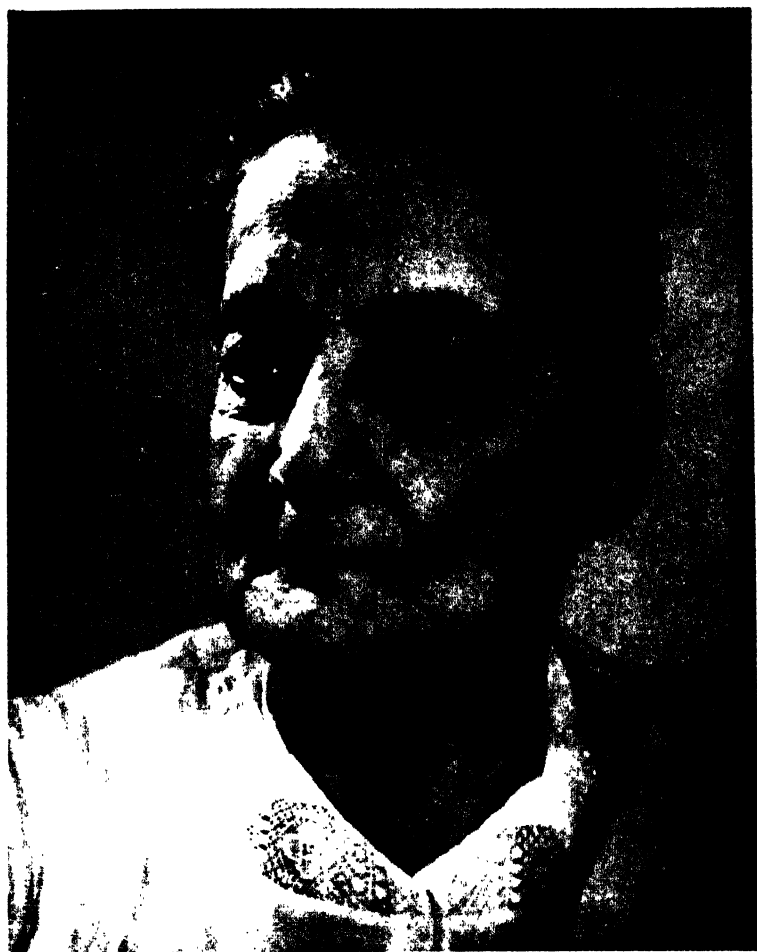
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

ছিন্নপত্রাবলীর পত্রে কবি নিজেই ইন্দিরা দেবীর কাছে ব্যক্ত করেছেন— 'আমিও জানি, তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোনো লেখায় হয় নি।··· যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।··· যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ,
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে,
তবে সে মর্মর ফুটে।'

শেষ জীবনে পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনে এসে ইন্দিরা দেবী তাঁর স্বর্গগত পূজনীয় রবিকাকার যোগ্যা ভাইঝি রূপে, তাঁর গড়া বিশ্বভারতীকে কত ভাবেই-না সাহায্য করতে থাকেন। সংগীতজ্ঞা ইন্দিরা দেবী এই সময়ে কত লুপ্তপ্রায় রবীন্দ্রসংগীত, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি বলে স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করে আবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। রবীন্দ্রসংগীতের সুরের বহু স্বরলিপি প্রণয়নপূর্বক, তাদের অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করে চিরদিনের মতো বেঁধে রাখেন পুস্তকের বন্ধনে।

'কালমৃগয়া'র মতো সুন্দর নাটকটিকে অনেক দিনের অবহেলিত, অনাদৃত অবস্থা থেকে তুলে এনে আবার প্রচলিত করে দেন নাট্যমঞ্চে।

গুরুদেবের অল্প বয়সের লেখা 'ভানুসিংহের পদাবলী'র মতো সুন্দর ভাবসমৃদ্ধ গানগুলিকেও একত্রে একটি নাটক রূপে গ্রথিত করে রসিকসমাজে পুনঃপ্রকাশ করেন।

এই সময়ে তিনি লেখেন 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' নামক মূল্যবান পুস্তক। তাঁর লেখা শেষ গ্রন্থ আমরা পাই তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' রূপে।

ইন্দিরা দেবীর মৃত্যুর মাত্র দুদিন পূর্বে হয় তাঁর সঙ্গে শেষ কথা। তখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। শান্তিনিকেতনের আলাপিনী-মহিলা-সমিতি পরিচালিত 'ঘরোয়া' পত্রিকাটির প্রকাশ এর কিছুদিন পূর্বে নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। দুঃখিত মনে এর কারণ ও একে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি না জানতে চাওয়ায় বলেন, "নানা কারণে এটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো যাক— মেয়েদের আরও কত

কি করবার আছে। কেউ যদি সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য অনুসন্ধান ক'রে মেয়েদের সম্বন্ধে কোথায় কি তিনি লিখেছেন তা একত্র করে প্রকাশ করতে পারেন— তবে মস্ত একটা কাজ হয়।"

কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী সম্বন্ধে তাঁর নিকট কিছু জানতে চাওয়ায় বলেন, "আমিও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তিনি ছিলেন স্বল্পায়ু, বহুদিন পূর্বে স্বর্গতা হয়েছেন। আমি শিশুকালটা পড়াশোনায় এত ব্যস্ত ছিলাম যে বাবার পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকোর কাকাদের ওখানে কমই যাওয়া হত। তবে আমার কাছে অনেক পুরানো ছবি আছে, তার মধ্যে তাঁর দু-একখানা ছবি থাকতেও পারে।"

পুরানো ছবির প্যাকেট খুলে দেখালেন কত ছবি। তার মধ্যে মৃণালিনী দেবীর ছবি না থাকলেও গুরুদেবের অনেক অদেখা ছবি দেখি। গুরুদেবের অল্প বয়সের শিশু-সন্তান-সহ সুন্দর সব ছবি। তার মধ্যে সব চেয়ে মনোহরণ-কারী ছবি— গুরুদেবের কম বয়সে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকে বাল্মীকি-বেশ-ধারী একটি ছবি। কিশোরী ইন্দিরা দেবী তাতে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন।

লক্ষ্মীর মতোই রূপলাবণ্যময়ী ইন্দিরা দেবী একটি ফুলের মালা হাতে তরুণ বাল্মীকির গলায় পরাতে অগ্রসর হচ্ছেন— আর বাল্মীকি অসম্মতির ভঙ্গিতে দু হাত নেড়ে পিছনে সরে যাচ্ছেন। ছবিটিতে দুজনেরই ভাব ফুটে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর হয়ে। অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী কাকা ও ভাইঝি— কাকে রেখে কাকে দেখি?

বিবিদি বলে উঠলেন, "রবিকাকার সাহচর্যে শৈশব কালটা যে আনন্দে কেটেছে তার আর তুলনা হয় না।"

তাঁদের স্নেহ-ভালোবাসার নিদর্শনের সামান্য একটু অংশ ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' থেকে তুলে ধরি—

"রবিকাকা আমাকে উদ্দেশ করে কবিতায় যে-সব পত্র লিখেছিলেন 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) সেগুলি বেরিয়েছিল। তার তিনটি এখনো 'কড়ি ও কোমলে' ছাপা হয়। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে হয় এই তিনটিই কাব্যরত্ন-বিশেষ, আর আমার সঙ্গে তার যোগ স্মরণ করে বিশেষ গৌরব অনুভব করি। আমার জন্মদিনে একটি সুন্দর পিয়ানোর মতো

গড়নের দোয়াত-দানি উপহার দিয়ে তার সঙ্গে যে কয়েক ছত্র লিখেছিলেন সেও তাঁর হাতের স্পর্শে উজ্জ্বল, এটিও 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সংস্করণে ছিল—

স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেত রে,
বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে
বল্ দেখি দিত কে তোরে।···"

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম ও সেকালের নাম-করা পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সেদিনের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা বঙ্গবালার মধ্যে তাঁর কন্যাগণ অগ্রগণ্যা। কি লেখাপড়ায়, কি সংগীতে, কি প্রগতিতে তাঁর মেয়েরাই সেদিনের মহিলা-সমাজের পুরোধায় ছিলেন।

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রদ্ধেয়া শান্তিময়ী দত্তর সঙ্গে সেদিন হঠাৎ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পর সাক্ষাৎ। তিনি সেকালের একজন সঙ্গীতজ্ঞা নামী শিক্ষিকা। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় আদি ছাত্রীদের অন্যতমা— বয়স বর্তমানে বাহাত্তর।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের প্রথম অগ্নিময় স্বদেশী যুগ। রবীন্দ্রনাথ তখন উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশী গানে বাংলাদেশ প্লাবিত করছেন। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরূপে গানের ক্লাসে গান শিখি— হঠাৎ একদিন ডাক এল রাস্তার অপর দিকের স্যার জগদীশ বসুর বাড়ি থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য-লেখা স্বরচিত স্বদেশী গান শোনাবেন সেখানে। বিদ্যালয়ের গান-জানা মেয়েরা তাঁর মুখ থেকে শুনে গানগুলি শিখে নেবে।

পরম উৎসাহে গিয়ে দেখি কবিকে। কী রূপ! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ— কালো রেশমের মতো চুলগুলি থোকা থোকা করে পাকানো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা —সুগৌর কপালে কয়েক গোছা পাক খাওয়া খাটো চুল, উন্নত নাসা, পদ্ম-পলাশ লোচন— দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ তরুণ কবি। পরিধানে তসরের ধুতি চাদর। চোখে ফ্রেমলেস্ চশমা কালো কারে গলায় ঝোলানো।

অর্গ্যানে বসেছেন সি. আর দাশের ভগ্নী অমলা দাশ। কবি এসে পকেট থেকে ছোটো নোট বই খুলে গাইলেন—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে—' এবং 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।'

প্রথমে তিনি একবার গাইলেন শুধু গলায়— তার পর অমলা দাশের বাজনার সঙ্গে। দরাজ উচ্চ কণ্ঠস্বর কিন্তু একটু মেয়েলী ঢঙের। তাঁর

সেই সু-উচ্চ মিষ্ট কণ্ঠস্বরে ঘরখানা যেন গম্ গম্ করে ভরে গেল।

আমরা মেয়েরা গান শিখব কি—গায়কের চোখ-ধাঁধানো রূপে—অতুলনীয় গানের মাধুর্যে যেন সম্মোহিত হয়ে চেয়ে রইলাম!

এর পর তিনি প্রতিদিন স্যার জগদীশ বসুর বাড়িতে এসে আমাদের আরও কয়েকখানা স্বদেশী গান শেখান। প্রধানত অমলা দাশ শেখালেও প্রতিদিনই তিনি এই গানের আসরে উপস্থিত থাকতেন।

ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের একপাশে ফেডারেশন গ্রাউণ্ড। সেখানে সর্বদাই নানা প্রকার সভা-সমিতি হয়। সেবার শুনি, সেখানে হবে বিরাট স্বদেশী সভা—সভাপতি আনন্দমোহন বসু। বক্তা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশের দিক্‌পালগণ। এ দিকে আনন্দমোহন বসু হয়ে পড়েন দারুণ অসুস্থ। তখন তাঁকে 'স্ট্রেচারে' করে নিয়ে আসা হয় সভামণ্ডপে এবং সেই পীড়িত অবস্থায়ই তিনি সভাপতির কাজ করেন।

অমলা দাশের নেতৃত্বে ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আমরা মেয়ের দল পর পর গাইলাম সদ্য-শেখা চারখানা বিখ্যাত দেশবন্দনার রবীন্দ্রসংগীত। ঐ বিশেষ দিনের কথা এত স্পষ্ট মনে আছে যে, মনে হয় যেন এই সেদিনের কথা।

শান্তিময়ী দত্ত পরবর্তী জীবনে শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র দত্তের সঙ্গে পরিণীতা হবার পর ব্রহ্মদেশবাসিনী হয়ে পড়েন। বাংলার সঙ্গে অনেক কাল আর বিশেষ কোনো সংযোগ না থাকলেও মনে মনে তিনি রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্রকাব্যানুরাগিণী চিরদিন। কবিগুরুর মৃত্যুর পর রেঙ্গুনের বৌদ্ধ পত্রিকা 'সংঘশক্তি'তে 'ধর্মাচার্য রবীন্দ্রনাথ' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে কবিগুরুর প্রতি তাঁর শোকার্ত প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তার থেকে তাঁরই ভাষায় কিছু বলি—

…আমি তখন বিদ্যালয়ের ছাত্রী—আমাদের পাড়ায় ধর্মপ্রাণ, কর্মযোগী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'দেবালয়' নামে একটি গৃহ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এটি এমন একটি সার্বজনীন স্থান হবে যেখানে সকল জাতির, সকল ধর্মের আচার্য, বক্তা ও প্রচারক নির্ভয়ে আপনার ধর্মমত প্রচার করতে পারবেন।

এই 'দেবালয়ে' একদিন রবীন্দ্রনাথ উপাসনা এবং বক্তৃতা করবেন সংবাদ

পেয়ে আমরা মহা-উৎসাহে সদলবলে দেবালয়ের একটি কোণে স্থান-গ্রহণ করে তাঁর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় থাকি। শিশুকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয়— কত ছবিতে দেখি তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি—তাঁর কাছাকাছি এসে পদধূলি নেবার মনে কত আকাঙ্ক্ষা!

সেদিন সন্ধ্যায় উপাসক এবং শ্রোতৃমণ্ডলী -পরিপূর্ণ গৃহে যখন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল তখন তাঁর সৌম্য কান্তি হৃদয়ে কি যে এক ভাবের সঞ্চার করেছিল— তা ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য নেই; শুধু এই বলতে পারি— চেয়েই রইলাম—দেখে যেন আশ মেটে না। মনে হল, ইনি বোধ হয় প্রাচীন ভারতের তপোবনের কোনো ঋষি গৃহস্থের গৃহে জন্মলাভ করেছেন। আসন গ্রহণ করে যখন উপাসনা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেন— সে কি মধুর কণ্ঠস্বর! সে যেন নারী-সুলভ সুললিত কণ্ঠের প্রাণমাতানো সংগীত!

স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাঁর বাণীগুলি— কি বলেছিলেন তা কিছুই স্মরণে নেই— শুধু রয়ে গেছে অন্তরের নিভৃত কোণে একটি রেশ— একটি ছাপ— যা কালের করাল স্পর্শ মুছে ফেলতে পারে নি— পারবেও না।

উপাসনান্তে উপস্থিত সকলের একান্ত অনুরোধে স্বরচিত—তখনও অপ্রকাশিত— দু-তিনটি গান নিজের খাতা দেখে গাইলেন। বাল্যকালে শোনা সেই দু-একটি গান যেন এখনও কানে লেগে আছে। একটি—'যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু, এবার এ জীবনে'। আর একটি— 'এই তো ভালো লেগেছিল, আলোর নাচন পাতায় পাতায়'।

…রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়ের 'গুরুদেব' ছিলেন। ছাত্র শিক্ষক প্রত্যেকেরই প্রাণের ডাক ছিল এটি। আমি যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র-বন্ধুদের মুখে 'গুরুদেব' শুনতাম, আমার মনটা বড়ো ক্ষুব্ধ হত, কারণ 'গুরুবাদ'কে বড়ো ভয়ের চোখে দেখতাম। পাছে গুরুর প্রতি অন্ধ ভক্তি জ্ঞানচক্ষুকে অন্ধ করে রাখে— স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করে— এই ভাবনা খুবই সতর্ক করে রাখত মনকে।

কিন্তু যতই কবির কাব্যের, সংগীতের, বিচিত্র রচনাবলীর মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলাম ততই যেন তাঁর সঙ্গে অন্তরের যোগ অনুভব করে সমগ্র প্রাণমন দিয়ে স্বীকার করে নিতে পারলাম— সত্যিই তিনি আমারও গুরুদেব।

কর্মজীবনে— রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-বিদ্যালয়টির শিক্ষা ও সাধনার আদর্শকে

সম্মুখে রেখে চলবার চেষ্টা করতাম। তাঁর প্রদত্ত 'শান্তিনিকেতনের' উপদেশগুলি প্রতিদিন প্রভাতে কর্মারম্ভের পূর্বে ভক্তিভরে পাঠ করতাম। তার থেকেই প্রাণে যে সহজ শুভ উদ্দীপনা লাভ করি, তাই আমার সারা জীবনের প্রধান সম্বল!

শান্তিদি তাঁর প্রথম জীবনের আরও দু-একটি ছোটোখাটো ঘটনা বলেন—পূর্বোক্ত দেবালয় বাড়িটি তাঁর পিতৃদেব সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ছিল আজীবনের বাসস্থল। দেবালয়ের পাশেই প্রবাসী আপিস ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি। গায়ে-গায়ে লাগানো দুটি বাড়ি—পাশাপাশি বারান্দা। বারান্দায় বসে কথা বললে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি স্পষ্ট শোনা যায়।

শান্তিদি তখন কাজ করেন বেথুনে। রামানন্দবাবুর কন্যাদ্বয় শান্তা দেবী ও সীতা দেবী বয়সে তখনও তরুণী এবং বেথুনের ছাত্রী।

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন রামানন্দবাবুর বাড়ি। তিনি এলে বারান্দায় শীতলপাটি বিছিয়ে বসত সাহিত্য ও সংগীত -সভা। শান্তা-সীতা পূর্বাহ্নেই শান্তিদির গোচর করতেন এ খবর। শান্তিদিরাও নিজেদের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতেন সে সভার রসাস্বাদনের আশায়।

অনেক দিনের কথা—শান্তিদির যতদূর মনে পড়ে, এমনি একটি সভায় সীতা দেবী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।'

তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, গাওয়ার সময় সর্বদাই আশেপাশের গায়ক-গায়িকাদের নিজের সঙ্গে গাইতে বলতেন ও গানটি শিখে নিতে বলতেন।

ঐ গানটি সেদিন রবীন্দ্রনাথ এমন একটি সুরে গাইলেন যে শান্তা-সীতা অবাক হয়ে নিঃশব্দে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ করে কবি বলেন, "কি রে, তোরা চুপ করে রইলি কেন? আমার সঙ্গে গাইতে পারলি না?"

সীতা দেবী বললেন, "কি করে গাইব? আপনি যে সম্পূর্ণ নতুন সুরে গাইলেন—এ সুর তো আমাদের জানা নেই!"

কবি হেসে বললেন, "তাই না কি? তোরা কি সুর শিখেছিস শোনা

দেখি।" তারা অন্ত সুরে গানটি গেয়ে শোনাবার পর তিনি বললেন, "তা হবে— আমারই হয়তো ভুল হয়েছে।"

কবি সব সময়েই বলতেন, "দিনু আমার সকল গানের ভাণ্ডারী, সকল সুরের কাণ্ডারী। আমি গানগুলো তার ভাণ্ডারে জমা দিয়েই নিশ্চিন্ত, জানি দিনুর ভাণ্ডারে তা অক্ষয় হয়ে জমা থাকবে।"

দিনুবাবুর ভাণ্ডারটিও ছিল অগাধ বিস্তৃত। মনের ভাণ্ডারে এত গান এত সুর জমা রাখা কি অসাধারণ ব্যাপার ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

গুরুদেবের রসিকতার পরিচয় একটুখানি পাই শান্তিদির নিকট। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিদির নিকট-আত্মীয়, মধুর-সম্পর্কিত ছোটো ভগ্নীপতি।

শান্তিদি বলেন, "প্রভাতের নিজের নাম বদলে আমাদের মধ্যে তার নাম প্রচলিত হয়েছিল 'বৈবাহিক'। সেই কথাই একটু গোড়া থেকে বলি—

প্রভাতবাবুর মা তাঁর সন্তানগণের অল্প বয়স থেকেই শান্তিনিকেতন-বাসিনী। গুরুদেবের আশ্রমের প্রথম পর্যায়ে তিনিও ছিলেন সেখানকার একজন মহিলা-কর্মী।

প্রভাতবাবু বড়ো হয়ে নিলেন গ্রন্থাগারের ভার এবং এতে সঞ্চয় করেন বহু অভিজ্ঞতা। ক্রমশ তিনি হন লেখায় অনুপ্রাণিত। রোজই বাড়ি যাবার সময় গ্রন্থাগার থেকে এক বোঝা বই নিয়ে বাড়ি যান রাত্রে পড়ে দেখার জন্য।

একদিন অপরাহ্ণে অমনি বইয়ের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন— এমন সময় দূর থেকে গুরুদেব ডাকতে থাকেন, 'ওহে বৈবাহিক— শোনো শোনো!'

প্রভাতবাবু অবাক! এ কি রহস্য গুরুদেবের? তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়ে বলেন, 'আপনি আমায় বৈবাহিক বলছেন কেন?'

গুরুদেব বলেন, 'আরে সে বৈবাহিক নয়— আমি ডাকছি তোমায় বৈ-বাহিক বলে!'

হেমলতা ঠাকুর

পুরীতে এসে (মে ১৯৬৪) বড়মার দর্শনলাভ জীবনের এক বড়ো প্রাপ্তি। শান্তিনিকেতনের এই বড়মা সকলের বড়মা। আজীবন পরার্থে আত্মোৎসর্গীকৃতা, বয়সে নব্বুই অতিক্রান্তা বড়মা পরম বিস্ময় নিয়ে চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিতা হলেন। এতটা বয়সে হাঁটা-চলায় শারীরিক অক্ষমতা এসে গেলেও মনের দিক থেকে মনে হয় আজও তিনি নবীনা। চোখের দৃষ্টি এত ভালো যে এই বিদুষী জ্ঞানতপস্বিনী আজও পড়াশোনা করেন চশমার সাহায্য বিনা। আর যে অদ্ভুত স্মরণশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তিনি কবিগুরুর ও নিজের লেখা বড়ো বড়ো কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিলেন। পুরোনো কথা বললেন অনেক।

গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁর নিকটে কিছু জানতে চাওয়ায় হেসে বলেন, "এই সুদীর্ঘ জীবনে কয়েকটা ভুল হয়ে গেছে। প্রথম— কখনও ভাবি নি নব্বুইয়ের কোঠায় এসেও বেঁচে থাকতে হবে, দ্বিতীয়— আমাদের আপন জন 'কাকা মশাই' যে এত বড়ো মানুষ— এমন মহামানব— তা বুঝতে পারি নি কখনও, বুঝলে তাঁর প্রতিটি কাজ প্রতিটি কথা মনের মণিকোঠায় সঞ্চয় করে রাখতুম পরবর্তী কালের জন্য। তবুও অনেক প্রবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছি। আমার লেখায় প্রকাশ পায় নি তেমনি দু-একটি ঘটনা মনে পড়ছে।"

বলেই বললেন গুরুদেবের সঙ্গে বহুকাল পূর্বের বুদ্ধগয়া-ভ্রমণের এক চমৎকার কাহিনী। বড়মা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরের পূজনীয় শ্বশুর দ্বিজেন্দ্র নাথ ও স্বামী শ্রদ্ধেয় দ্বিপেন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনবাসী, গুরুদেবের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী তখন সবে প্রথম সন্তানের জননী, তেমন দিনে গুরুদেবের বুদ্ধগয়া দর্শনের সব স্থির, সঙ্গে যাবেন মীরা দেবী ও তাঁর স্বামী নগেনবাবু এবং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও কয়েকজন। বড়মাও তাঁর শ্বশুর ও স্বামীর অনুমতি নিয়ে এই সুযোগে বুদ্ধগয়া দর্শনের উৎসাহে কবির অনুগামিনী হলেন।

বুদ্ধগয়ার প্রধান মোহন্তের অতিথিরূপে তাঁরা স্থান পেলেন সেখানকার

অতিথিশালায়— আদর-আপ্যায়নে মর্যাদা পেলেন রাজকীয়। প্রতিদিন প্রাতরাশের পর গুরুদেব বুদ্ধমন্দিরে গমন করতেন একাকী এবং প্রায় দু তিন ঘণ্টা তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। সঙ্গের কিংবা বাহিরের কেউ সে সময়ে মন্দিরে যেতে পারবে না, এই নিষেধাজ্ঞা সকলের জানা থাকলেও বড়মা বলেন— তাঁর মনে জাগে দারুণ কৌতূহল এবং এক প্রশ্ন। প্রশ্নটি— কাকামশাই এত সময় মন্দিরে কি করেন? মূর্তিপূজার বিরোধী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র— রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধমন্দিরে কেন অতিবাহিত করেন অতটা সময়?

কৌতূহল নিরসনে অধীর হয়ে একদিন তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে নিষিদ্ধ সময়েই যান মন্দিরে এবং ভেজানো দরজা ঈষমুক্ত করে দেখতে পান উচ্চ বেদিতে উপবিষ্ট বিরাট বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান কবিগুরুর ধ্যানগম্ভীর নিশ্চল প্রতিমূর্তি, দুই চক্ষে দরবিগলিত অশ্রুধারা!

বড়মা বলেন— শোনো এবার সেই যাত্রারই আর-এক ঘটনা। বুদ্ধ-গয়ায় কিছুদিন থাকা হবে এ কথাই সকলের জানা ছিল। সুসাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের বৌদ্ধ নিদর্শন সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখালেন। আমার ইচ্ছা হল গয়ার প্রাচীন বিখ্যাত বিষ্ণুর মন্দির ও হিন্দুর পূর্বপুরুষকে পিণ্ডপ্রদানের স্থান দেখার। উদারচিত্ত কাকামশাই অনুমতি দিলেন।

ইতিমধ্যে শোনা গেল এক ধনী গয়ালী মোহন্ত আসবেন কবির দর্শন-মানসে। কাকামশাই আমাদের সাবধান করে দিলেন ঐ মোহন্তের দৃষ্টি-পথে যেন কিছুতেই না আসি। ঐ গয়ালীর চরিত্র সম্বন্ধে কানাঘুষায় নানা কথা শোনা যাচ্ছিল বলেই বোধ হয় তাঁর এই নিষেধবাণী। অনেক ভেট নিয়ে এলেন মোহন্ত কিন্তু কাকামশাই যে তার আগমনে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করেছেন তা মোহন্ত চলে যাবার পর— তাঁর কথায় প্রকাশ পেতে লাগলো।

এর দু-এক দিন পরেই ঘটে এক বিপরীত কাণ্ড! হঠাৎ গয়ার এক গোয়ালা এসে বক্ষে করাঘাত করে কাকামশাইয়ের নিকট পূর্ববর্ণিত মোহন্তের বিরুদ্ধে নানা নালিশ জানাতে লাগলো ও প্রতিকারের দাবিতে আরজি পেশ করে বলল, "হুজুর, আপনার অনেক ক্ষমতা আপনি বাঁচান আমাকে মোহন্তের হাত থেকে।"

কাকামশাই খানিক স্তব্ধ হয়ে থেকে বলেন, "আমার এ বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতা নেই, তুমি অন্য উপায় অবলম্বন করো।" মোহন্তের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী শুনে তিনি এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে গোয়ালাকে কথাগুলো বলেই ভিতরে এসে বলেন, "আর এক মুহূর্ত আমি এখানে থাকতে চাই না, আজই যে ভাবে হোক অন্যত্র যেতে হবে।" বলা বাহুল্য, লোকটির দুর্দশার কাহিনী শুনে কাকামশায় তার হাতে কয়েকটি টাকাও দিয়েছিলেন।

হল না গাড়ি-রিজার্ভ— হল না আমাদের বিষ্ণুমন্দির দর্শন— কাকামশাই এমন জোর হুকুম দিলেন যে সেদিনই আমাদের করতে হল স্থান-ত্যাগ। সকলকে নিয়ে কাকামশাই এলেন এলাহাবাদে ও তার পর আগ্রায়। আগ্রা এসে দিনে রাত্রে কতবার করে তাজমহল দেখে আমাদের আর আশা মেটে না— কিন্তু কাকামশাই আছেন নিজের ভাবে— তাজমহল দেখার কোনো আগ্রহ দেখি না তাঁর মধ্যে। অবশেষে হঠাৎ একদিন গেলেন তাজ দেখতে এবং ফিরে এসে লেখেন 'তাজমহল' কবিতাটি।

বড়মার নিকটে গুরুদেবের গার্হস্থ্য জীবনের প্রথম পর্যায়ের দু-একটি মনোরম চিত্র পাওয়া গেল। বড়মার লেখায় ইতিপূর্বে আংশিক প্রকাশিত হলেও ঘটনাগুলি কৌতুককর। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনেরও পূর্বে কবিজায়া প্রথম যাবেন শান্তিনিকেতনে সংসার পাততে। কবি বলেন, "অবান্তর বাহুল্য জিনিস সঙ্গে যাবে না কিছু। সেখানে আমাদের হবে আশ্রমজীবন— ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে একান্ন হবিষ্যে; কাজেই বাদ দাও তোমাদের হাঁড়ি-কড়া-হাতা-খুন্তি প্রভৃতি যত অবান্তর জিনিস— ওগুলো সব বাহুল্য বোঝা।"

কবিপত্নী শুনলেন সব— কিন্তু যাবার সময় অতি সঙ্গোপনে সঙ্গে নিলেন সবই। মৃণালিনী দেবী পরিহাস করে বড়মাকে বলেন, "শোনো তোমার শ্বশুরের খেয়াল, উনি নাকি শান্তিনিকেতনে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির আশ্রম গড়বেন!"

আসা হল শান্তিনিকেতনে। কিছুদিন কাটার পর হঠাৎ একদিন এলেন মাননীয় অতিথি গুরুদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। কবি উৎকণ্ঠিত হয়ে আসেন পত্নী-সকাশে, বলেন, "বন্ধু এসেছেন এখানে— খুব ভালো জিনিস তাঁর পাতে না দিলে তো ভালো লাগে না।"

মৃণালিনী দেবী ছিলেন রন্ধনে সিদ্ধহস্তা। তাঁর হাতের তৈরি মিঠাই-এর

স্বাদ হত অপূর্ব ! কবি বললেন, "পারবে কি তোমার আমের মিঠাই, দই-এর মালপো, চিঁড়ের পুলি প্রভৃতি খাবারগুলো করতে ?" মৃণালিনী দেবী ঈষৎ হেসে বলেন, "হ্যাঁ হবে— সব হবে।" কবি চলে যাবার পর বড়মাকে বললেন, "দেখলে তো তোমার শ্বশুরের কাণ্ড ! এখানে হাতা-খুন্তি-কড়ার মতো বাহুল্য উপকরণের কোনো প্রয়োজন নেই বলেছিলেন— এখন ? হাতা-খুন্তি না হলে কি করে এই তেপান্তরের মাঠে তৈরি হত মিষ্টি-মিঠাই !"

বড়মা হেসে বলেন— প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতি— তাঁর কি ভালো করে অতিথিসেবা করতে না পারলে মন ভরে ? পরিহাসপ্রিয় কবি একবার ঠাট্টা করে পত্নীকে বলেন, "তোমরা আর কী রাঁধতে জান ? আজ আমি একটি ভালো রান্না শেখাবো।" তার পর কিছু আলু ও কড়াইশুঁটি সিদ্ধ করার পর কাঁটার সাহায্যে মিশিয়ে তা দিয়ে ছোটো ছোটো গুলি করে আধকড়া ঘিয়ে গেলেন ভাজতে। কবিজায়া যত বলেন এ ভাবে ভাজা যাবে না— এতে কিছু ময়দা কি বেসন দিতে হবে— কবি ততই বলেন কেন হবে না ? না হবার তো কোনো কারণ নেই— নিশ্চয় হবে। তার পর গরম ঘিয়ে সেইগুলি ছাড়া মাত্র চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ছত্রাকার হয়ে যায়। মৃণালিনী দেবী হেসে বলেন— হল তো ? কবিও হেসে বলেন— এ রকম হবার তো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না !

শান্তিনিকেতনে আসার পর একটি বৎসরও ঘুরে এলো না— মৃণালিনী দেবী হয়ে পড়েন দারুণ অসুস্থ। অনেক দিন রোগভোগের পর তিনি অকালে দেহত্যাগ করার পরে কবি আহার-বিহারে হন নির্লিপ্ত উদাসীন, গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমের মতো কালো কুঞ্চিত কেশ দেন বিসর্জন। ছোটো করে ছাঁটা চুল— নামমাত্র আহার— দেখতে দেখতে চেহারা যায় পাল্টে। তাঁর কৃশ তনু, প্রায়-মুণ্ডিত মস্তক দেখে বড়দিদি সৌদামিনী দেবী চোখের জল সম্বরণ করতে পারেন না। তিনি বড়মাকে ডেকে বলেন— "বড় বৌমা, রবির দিকে তো আর তাকানো যায় না— কি চেহারা কি হয়েছে। ওকে ভালো করে খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভার তোমার উপরে। তুমি ওর খাওয়ার সময়ে কাছে থেকে কথাবার্তায় ভুলিয়ে অন্যমনস্ক করে পেট ভরে খাইয়ে দিও— এ কাজ তুমি ভিন্ন আর কেউ পারবে না। তুমিই বোধ হয় ওর পূর্ব জন্মের মা।"

সেই থেকে বড়মা খুড়শ্বশুরকে খাওয়াবার ভার নিলেন, এবং অতি সন্তর্পণে

ও সুকৌশলে এই গুরু দায়িত্ব পালন করে তাঁর চেহারার উন্নতি সাধন করলেন। বড়মা বলেন—"ঘরের গোরুর দুধ নিজের হাতে ঘন করে তাতে মোটা সর পেতে সেই সর কাকামশাইয়ের বৈকালিক জলযোগে খাওয়াতে চেষ্টা করেছি—সবটা না খেলেও যতটুকু খেতেন তাতেই অনেক উপকার হয়েছিল।"

বড়মা আরও বলেন—কাকিমার মৃত্যুর প্রায় বৎসর চারেক পরে একদিন ভৃত্য উমাচরণ চিঁড়ের পুলি করে এনে দিয়েছিল। এই ভৃত্যটির খাবার তৈরিতে বেশ হাত ছিল—তাই ভালো হয়েছে মনে করে কাকামশাইকে আস্তে আস্তে বলি, "কাকামশাই, উমাচরণ চিঁড়ের পুলি করেছে, একটুখানি চেখে দেখুন।" কিছু ক্ষণ গম্ভীর ভাবে থেকে তিনি বলেন, "বাড়ির তৈরি খাবার তোমরা আর আমাকে খেতে বোলো না।"

হেমলতা দেবী তাঁর কাকামশাইয়ের সেবা করেছেন প্রাণ ঢেলে অনেক দিন ধরে। মৃত্যুশয্যায়ও ছিলেন পাশে। সেদিন রাখী-পূর্ণিমা। তাঁরই প্রবর্তিত রাখীবন্ধন উৎসবে শ্রাবণের যে পূর্ণিমা দিনটিতে কবিগুরু রাখী দিয়ে সকলকে বেঁধেছিলেন সৌহার্দ্যের সূত্রে—সেই পুণ্য দিনটিতেই দ্বিপ্রহরে তিনি মর্তের সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেন অমর লোকে।

বড়মা কবির জীবিত কালে তাঁর উদ্দেশে লেখেন—

হে কবি, তোমার ছবি রহিবে অঙ্কিত
তোমার অপূর্ব গীত হইবে ঝঙ্কৃত
হৃদয়মন্দিরমাঝে আমা সবাকার,
রচিবে পূজার অর্ঘ বিশ্বদেবতার।···

আর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে লেখেন—

এলো রে এলো রে ফিরে বাইশে শ্রাবণ
বরষার ধারা সাথে অশ্রুর প্লাবন
মিশি হল এক।
চক্ষু হারাইল দিশা
কবির আনন্দচ্ছবি ঢাকিল কি নিশা।
পূর্ণিমাবাসরে আসি দিবা দ্বিপ্রহরে—
এক ঘর হতে তাঁরে নিতে অন্য ঘরে।···

পিয়ার্সন হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কঠোর কর্তব্যপরায়ণ, অক্লান্ত কর্মী, সেবাব্রতধারী। উদার ধর্মপ্রাণ এই ডাক্তারবাবু সমগ্র শান্তিনিকেতন ও তৎপার্শ্ববর্তী সুদূর গ্রামাঞ্চলের ব্যাধি-নিপীড়িত মানুষের এক পরম ভরসার স্থল। যদিও তিনি বহুদিন পূর্বের পাস-করা প্রাচীন ডাক্তার— নেই কোনো বিলাতি ছাপ তবু তাঁর চিকিৎসায় এ দিকের সকলের অখণ্ড বিশ্বাস এবং সত্যই তাঁর রোগনির্ণয়ক্ষমতা এবং আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি বিস্ময়কর।

তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণীও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ভক্তিমতী মহিলা। তিনি বলেন যে— তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছেন তাঁর অল্প বয়সে, গুরুদেব দেহরক্ষা করার প্রায় সাত-আট বৎসর পূর্বে। সে সময়ের শান্তিনিকেতনের সামান্য একটু চিত্র তাঁর নিকট পাই। তিনি বলেন যে, তখনও এই প্রতিষ্ঠান এত বড়ো হয়ে ওঠে নি ; তখন এখানে কর্মী ছিল অল্প, ছাত্র-ছাত্রীও তাই— কিন্তু সকলে এক প্রীতির সূত্রে গ্রথিত হয়ে যেন এক পরিবারভুক্ত ছিল। সকলেরই মনে ছিল আনন্দ। এখানে তখন না ছিল কারও অপরিমিত অর্থ, না পাওয়া যেত পর্যাপ্ত আহার্য। ডাল-ভাতের উপরে একটা কুমড়োর তরকারি অথবা দুটো ডালের বড়া হলে সকলে যেন বর্তে যেতেন। মাছ-মাংস খাওয়ার বিলাসিতা ছিল কদাচিৎ— দু মাইল দূরের বোলপুর বাজারে ভিন্ন তা পাওয়াও যেত না।

সাধারণ কর্মীর মাইনে ছিল পঞ্চাশ-ষাট টাকা, তাও আবার মাঝে মাঝে দুই তিন মাস বাকি পড়ত। সন্তানসন্ততি-সহ পরিবারটি তখন খায় কি? সম্বল ঐ ডাল আর ভাত। কিন্তু গুরুদেবের সদয় ব্যবহারে, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ঐ অর্থের অনটন যেন কারও গায়েই লাগত না, মন যেন সর্বক্ষণ আনন্দরসে সিঞ্চিত থাকত। তখন মাঝে মাঝে প্রায়ই গুরুদেব নাচ-গানের দল নিয়ে শান্তিনিকেতনের বাইরে যেতেন। দেশ-বিদেশ ঘুরে নাচ-গানের মাধ্যমে কিছু অর্থ-উপার্জন করে নিয়ে এলে আবার সকলে কিছুদিন নিয়মিত মাইনে পেতেন এবং বিদ্যালয়ের নূতন নূতন বিভাগ খোলা হত।

রোগযন্ত্রণায় দেহমনের অবস্থা পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তারদির মনে আজও উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে গুরুদেবের জন্মদিনের বিশেষ রূপ ও সমারোহ। সেই বিশেষ দিনটিতে গুরুদেব ধুতিচাদরে শোভিত হয়ে চন্দন-চর্চিত ললাটে যখন হাসিমুখে প্রণামাভিলাষিগণকে কুশল প্রশ্ন করতেন তখন তাঁকে দেবমূর্তি বলে মনে হত এবং তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে আত্মনিবেদনের ইচ্ছা আপনা থেকেই মনে জেগে উঠত।

প্রায়ই গুরুদেবের জন্মদিনে তাঁকে এখানকার মহিলারা প্রত্যেকে কিছু-না-কিছু স্বহস্তে রেঁধে খাওয়াতেন—ব্যবস্থা করতেন ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী ঠান্‌দি। একবার ঠান্‌দি বলেন, সব মেয়েরা এবার খাবার করে দাও বিভিন্ন রকম। সমস্ত শান্তিনিকেতনবাসিনী তৈরি করেন পিঠে, পুলি, পরমান্ন। ডাক্তারদি দিয়েছিলেন কুমড়োর জেলি ও রসপুলি। বিকেলে সকলে উত্তরায়ণে গিয়ে দেখে অগণিত পাত্রে গুরুদেবের জলযোগ সজ্জিত।

হাসিমুখে মিতাহারী গুরুদেব বললেন, "কাউকে নিরাশ করব না, সব খাবার এক বিন্দু করে চেখে দেখব।" তখন প্রত্যেকটি খাবারের নাম এবং প্রস্তুতকারিণীর নাম তাঁকে বলে দেওয়া হয়। ডাক্তারদির কুমড়োর জেলিতে হাত দিয়ে বললেন, "এটা একটা নূতন জিনিস, কখনও খাই নি তো?" সামান্য একটু আস্বাদন করে বললেন, "ভালোই।"

আর-এক জন্মদিনে মহিলারা তাঁকে দিলেন বস্ত্র। রুমাল থেকে আরম্ভ করে পোশাক-আশাক, যার যা মন চায় দিলেন। গরদের ধুতি ও বাতিকের কাজ-করা উত্তরীয় দিলেন অনেকেই। রেশমী অথবা সূতী হস্ত-প্রস্তুত নানাবিধ সৌখীন টুকিটাকি জিনিস— সবই তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করলেন।

আর-একবার আশ্রমবাসী মহিলা ও পুরুষ সকলে মিলে তাঁকে দেন চামড়া ও কাষ্ঠনির্মিত নানাবিধ দ্রব্য। চামড়ার কাজের মধ্যে ছিল, বাতিক ও খোদাই কাজের মোড়া, পোর্টফলিও, পাদুকা, অর্থাধার, কুশন-কাভার, ব্যাগ প্রভৃতি। কাষ্ঠদ্রব্যের মধ্যে 'পোকারের' কাজে অলংকৃত নানাবিধ ছোটোখাটো দরকারি জিনিস। গুরুদেব এঁদের হাতের শিল্পকর্ম দেখে অত্যন্ত খুশি হতেন এবং সকলকে নূতন প্রেরণা, উৎসাহ ও আশীর্বাণীতে অভিষিক্ত করতেন। তাঁর জন্মদিনের উজ্জ্বল রূপটি আজও ডাক্তারদি জীবনের দুঃসহ আবর্তের মধ্যে পড়েও ভুলতে পারেন না।

ডাক্তারদির প্রথম গুরুদেব-সাক্ষাৎ।—মনভরা সরম-কুণ্ঠা, লজ্জাজড়িত চরণ নিয়ে তিনি যান গুরুদেব-দর্শনে উত্তরায়ণে। পৃথিবী-বিখ্যাত জ্ঞানতপস্বী নোবেল-লরিয়েট মহাকবি রবীন্দ্রনাথ— তাঁর সঙ্গে কি কথা বলবে স্বল্প-শিক্ষিতা পল্লিবালা? তবুও মৃদু চরণে গিয়ে তাঁর পদস্পর্শ করেন। গুরুদেব ডাক্তারের স্ত্রী শুনে পরম আগ্রহে স্বাগত সম্ভাষণ করে বলেন, "তোমার দেশ কোথায়?"

'আগরতলা' শুনে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

বাংলার এক কোণে পার্বত্য প্রদেশ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকাল— প্রাচুর্যে ঝলমল। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দুগ্ধবতী গাভী— দেশ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, প্রজারঞ্জক রাজার শাসনে রাজা-প্রজা সকলেই খুশিতে প্রাণবন্ত। পাহাড়ে জঙ্গলে বিচরণ করে নানাবিধ বন্যজন্তু, ব্যাঘ্র, হস্তীযূথ। প্রতি বৎসর কিছু বন্য হস্তী মানুষের হাতের ফাঁস গলায় পরে আসে রাজধানীতে। সে-সব হাতি ধরার বিবরণ লোমহর্ষক উপন্যাসের চেয়ে কম আশ্চর্য নয়, নূতন-ধরা হাতিকে পোষ মানানোর ব্যাপার আবার আরও চমকপ্রদ।

গুরুদেবের সঙ্গে আগরতলার নিকট-সম্বন্ধ। তিনি সেখানে রাজ-অতিথি হয়ে জীবনে অনেক সময় মনের আনন্দে কাটিয়ে এসেছেন। কত নাটক, কত কবিতা লিখেছেন ত্রিপুরা সম্বন্ধে।

গুরুদেব এমন রসালো ভাষায় হাতির গল্প, বাঘের গল্প আরম্ভ করে দিলেন যে ডাক্তারদির আর মনে রইল না একজন পৃথিবীবিখ্যাত মহামানবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মনে হল, স্বদেশের এক অতি নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা বহুদিন পর, আশ মিটিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছেন— কত পুরানো কাহিনী। অনেক ক্ষণ এ ভাবে কাটার পর হঠাৎ তাঁর মনে হয়, 'এ কি! আমি কোথায়? এত কথা বলে কার সময় নষ্ট করছি!' মুহূর্তে বিস্মৃতি থেকে স্মৃতিতে ফিরে এসে তড়িৎ-গতিতে প্রণামান্তর বিদায় চাইলেন।

দরদী স্বরে গুরুদেব বললেন, "আবার এসো।"

তাঁর পুত্র-কন্যা সকলেরই জন্ম শান্তিনিকেতনে, প্রথমা কন্যা ও প্রথম পুত্রের নামকরণ করেন গুরুদেব— সুমিতি ও সুমিত্র। ডাক্তারদির নাম?

জিজ্ঞাসাই করা হয় নি— এতক্ষণ পর জিজ্ঞাসায় জানি— সরযূবালা দেবী।

গুরুদেবের অন্তিমকালের শেষ দু-একটি কথা অন্য এক বন্ধুর নিকট শুনি— শেষ রোগশয্যায় তাঁর সেবানিরত দু-একটি সেবাব্রতীর নিকট গুরুদেব মৃত্যুর দু-চার দিন পূর্বে বলেন, "আমি এবার বুঝতে পারছি, আমার এ পৃথিবীর দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবার যাবার সময় হয়েছে।"

সেবাব্রতীরা বলেন, "কেন গুরুদেব, এ কথা বলছেন? আপনি ভালো হয়ে উঠবেন।"

মৃদু হেসে তিনি বললেন, "না রে, আমি বুঝতে পারছি আর দিন নেই।"

গুরুদেব মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন, "আমি যেমন কোনো অশোভন কাজ পছন্দ করতাম না তেমনি নিজেও কখনও করি নি। এ আমার মনের গোপন অভিমানের কথা। অভিমান-অহংকার বিন্দুমাত্র থাকলেও তো তাঁর নিকট যাওয়া যায় না— তাই তিনি নিজের কাছে নেওয়ার আগে আমার জ্ঞাত কি অজ্ঞাত সব অভিমান, সব অহংকার ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছেন। নিজের দেহকে আমি সর্বক্ষণ যথাসাধ্য আচ্ছাদিত করে রেখেছি। এমন-কি অসুখের ভিতরেও দেহের পরিচ্ছন্নতার তাগাদায় অন্যের স্পর্শে সর্বদেহ সংকুচিত হয়ে উঠেছে। দুদিন আগেও দেহটা আমার নিজের ভেবে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছি— কিন্তু কাল থেকে সে কথা মোটেই মনে হচ্ছে না; কাজেই সংকোচবোধও দূর হয়ে গেছে। এর থেকেই মনে হচ্ছে— দিন ফুরিয়ে এল।"

পরদিনই হয় অপারেশন— তার অল্প দিন বাদেই সব শেষ। মৃত্যু তাঁর দেহকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে নিলেও মনে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী চিরজীবী হয়ে বেঁচে রইলেন চিরদিনের জন্য।

—